রামরাজ্যের কথা

রামরাজ্যের কথা

দেবনারায়ণ গুপ্ত
অধ্যাপক রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় (নাট্যবিভাগ)
কলিকাতা
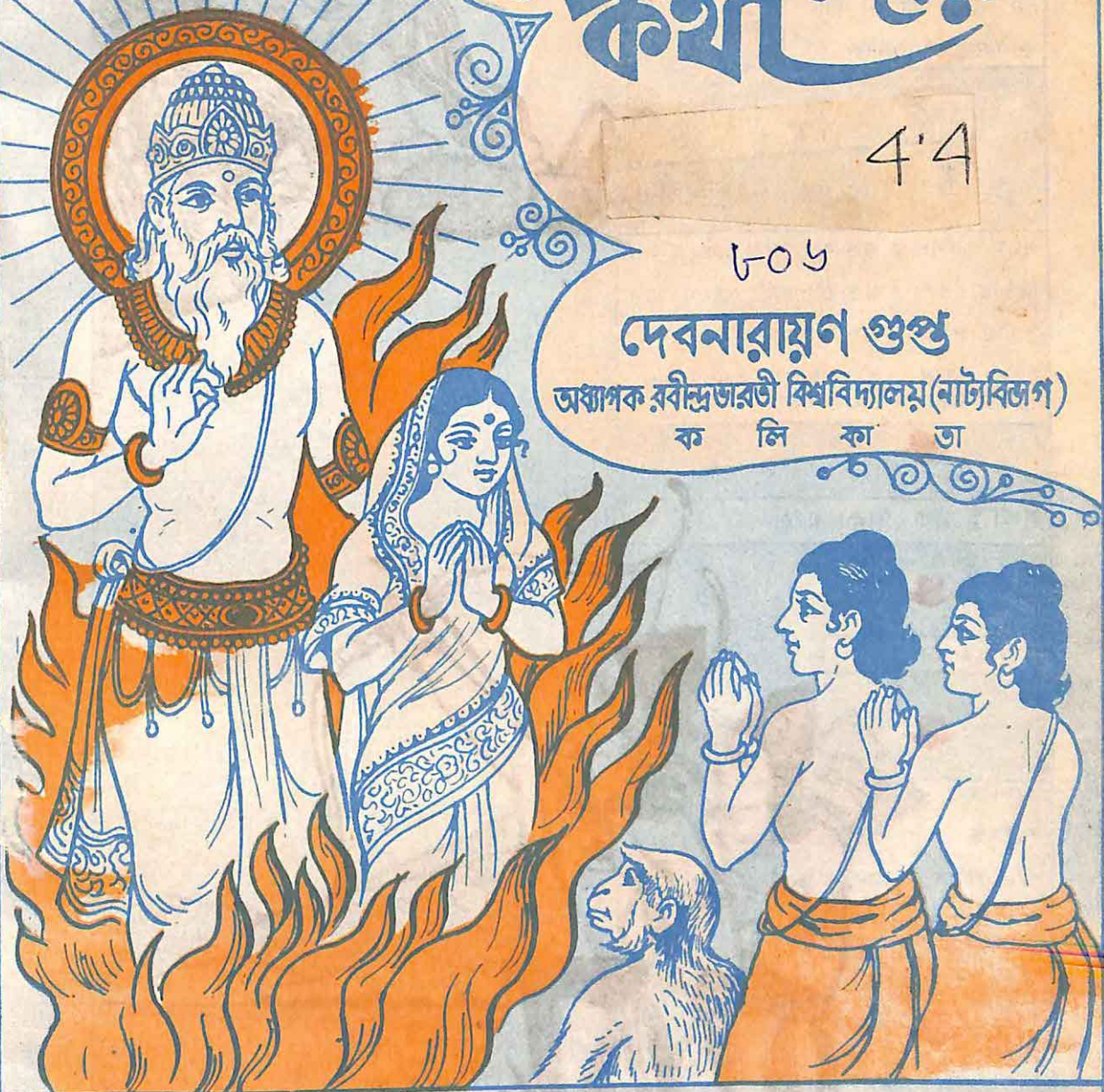
প্রকাশক ঃ

শ্রীসুধীর কুমার মণ্ডল

"মণ্ডল এণ্ড সন্স"

১৪, বঙ্কিম চ্যাটার্জী স্ট্রীট

কলিকাতা-৭০০০৭৩

প্রথম প্রকাশ ঃ শুভ ঝুলনযাত্রা, ১৩৮৫ সাল

দ্বিতীয় প্রকাশ ঃ শুভ শ্রীপঞ্চমী, ১৩৮৫ সাল

তৃতীয় প্রকাশ ঃ শুভ ঝুলনযাত্রা, ১৩৮৬ সাল

চতুর্থ প্রকাশ ঃ শুভ মহালয়া, ১৩৮৭ সাল

অষ্টম প্রকাশ ঃ ১৩৯৩ সাল

মূল্য ঃ নয় টাকা মাত্র

কম্পোজ ঃ

আর্টপুল

৬/১, শ্রীমন্ত দে লেন,

কলিকাতা-৭০০০১২

মুদ্রাকর ঃ

ক্যালকাটা আর্ট ষ্টুডিও [illegible]ঃ লি
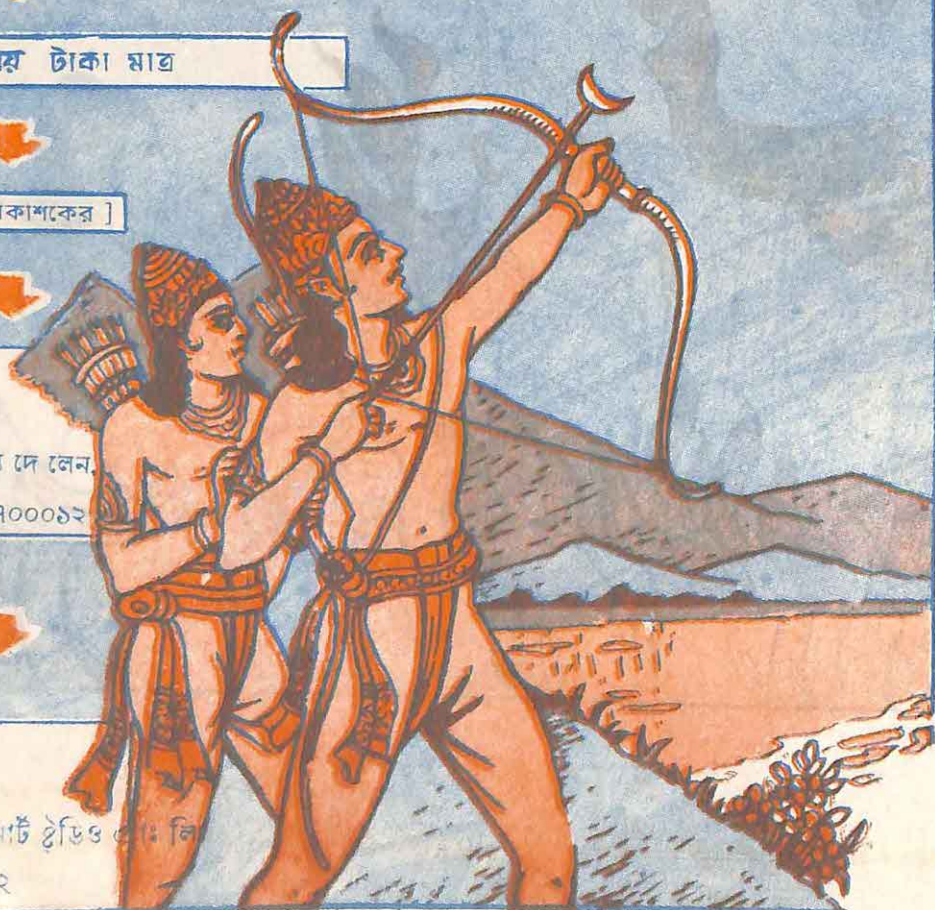
কলিকাতা-১২

আমার কথা

দ্বিতীয়বার ছোটদের উপযোগী করে রামায়ণ রচনা করলাম। ইতিপূর্বে প্রায় কুড়ি বছর আগে, এক প্রকাশনা প্রতিষ্ঠানের পক্ষে, ছোটদের উপযোগী রামায়ণ ও মহাভারত রচনা করে দিয়েছিলাম। বই দু'টি ছাপা হয়ে বাজারে বেরুনোর কিছুদিনের মধ্যে উক্ত প্রতিষ্ঠানের অবলুপ্তি ঘটে। প্রকাশক আমার বন্ধুস্থানীয়। কাজেই সম্মান দক্ষিণার ব্যাপারে তাঁর কথামত অপেক্ষা করি। এরই মাঝে প্রতিষ্ঠানের দরজা বন্ধ হয়ে যায়। বই তখন প্রকাশকের সর্বস্বত্ব বুকে ছেপে বাজারে বেরিয়েছে।

এই ঘটনার কয়েক বছর পরে দেখি, অন্য এক প্রকাশক বই দু'টি ছেপে বাজারে ছেড়েছেন। সেই বইয়েতেও নতুন প্রকাশকের স্বত্ব বলে ঘোষণা করা হয়েছে। আমি জানি, এই দুই প্রকাশকের কাছে আমি যে সর্বস্বত্ব বিক্রী করেছি, আমার স্বাক্ষরিত এমনতর দলিল তাঁরা বার করতে পারবেন না। এই ব্যাপারে উত্তেজিত হয়ে এক সময়ে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণে উদ্যত হয়েছিলাম। কিন্তু মণ্ডল এণ্ড সন্স-এর শ্রীসুধীর মণ্ডল আমাকে বলেন—'কি হবে স্যার, এসব করে? হাতে আপনার কলম রয়েছে, আবার লিখুন। আমি ভাল করে ছাপবো'। সুধীর ভায়ার কথামত নতুন করে লিখলাম 'রাম রাজ্যের কথা'। অবশেষে যাদের জন্য এই বইখানি লিখলাম, আমার সেইসব স্নেহের কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের ভাল লাগলে এবং শ্রদ্ধেয় শিক্ষক শিক্ষিকাগণের মনোনীত হলে, আমার শ্রম সার্থক হয়েছে বলে মনে করবো। ইতি—

শুভ জন্মাষ্টমী, ১৩৮৫
কলিকাতা।

দেবনারায়ণ গুপ্ত

অষ্টম সংস্করণের ভূমিকা

প্রথম, দ্বিতীয় এবং ষষ্ঠ সংস্করণ নিঃশেষ হওয়ার পর, সপ্তম সংস্করণ প্রকাশ করা হ'ল। বইটি শ্রদ্ধেয় শিক্ষক-শিক্ষিকাগণের মনোনীত ও কোমলমতি ছাত্র-ছাত্রীদের উপযোগী হয়েছে জেনে আনন্দিত। যাদের জন্য লিখেছি, তাদের খুশী করার জন্য বইখানিকে অফসেটে ছাপা হ'ল। শুধু তাই নয়, আগের সংস্করণের ভুল-ত্রুটি যথাসাধ্য সংশোধন করা হ'ল।

দেবনারায়ণ গুপ্ত

আমার চার মূর্তিমান নাতি—
বাবিন, যীশন, কেল্টু ও রুবাই-কে দিলাম।
ইতি আশীর্বাদক
দাদুমা
RATISH

আদিকাণ্ড
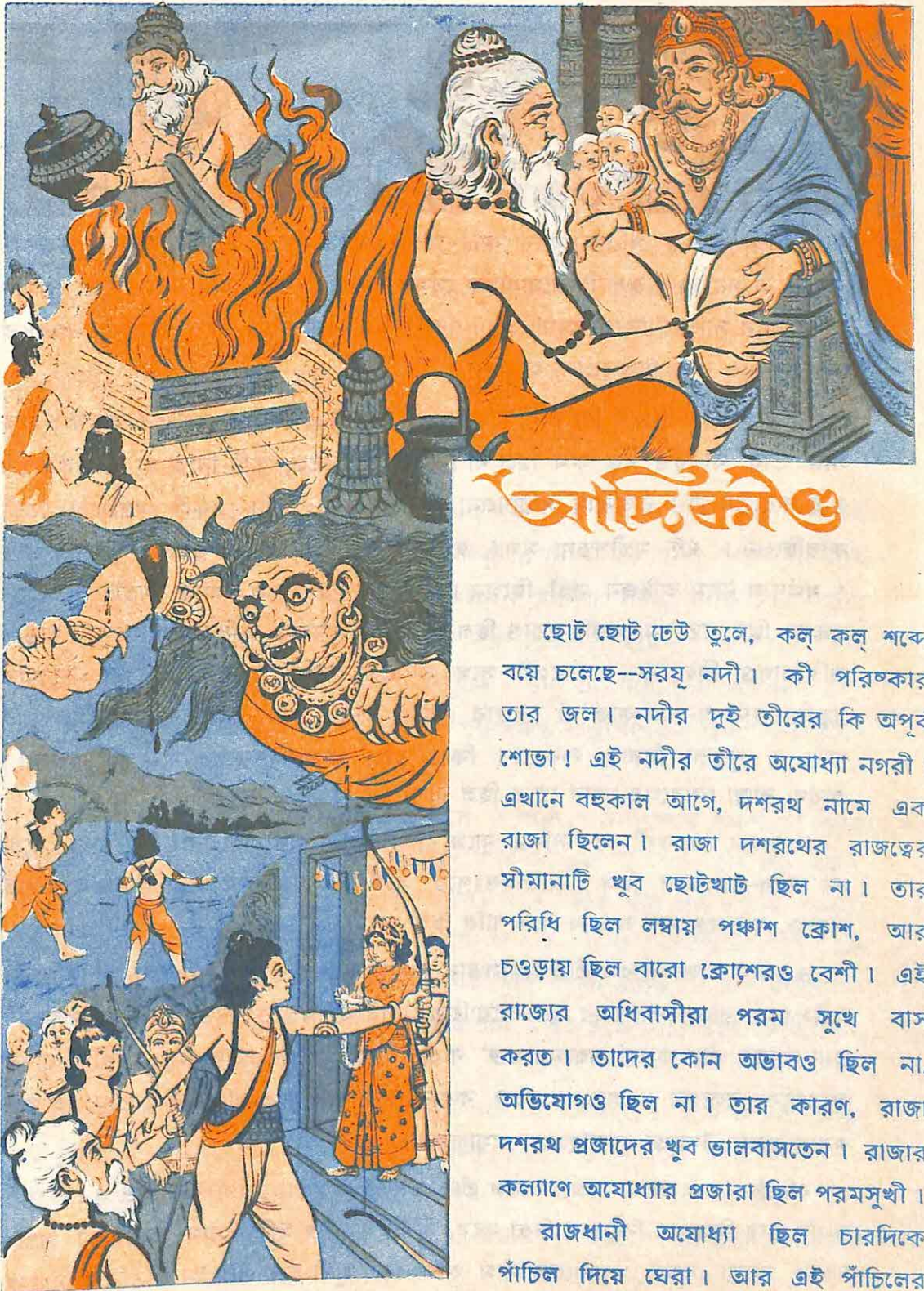
ছোট ছোট ঢেউ তুলে, কল্ কল্ শব্দে বয়ে চলেছে--সরযূ নদী। কী পরিষ্কার তার জল। নদীর দুই তীরের কি অপূর্ব শোভা! এই নদীর তীরে অযোধ্যা নগরী। এখানে বহুকাল আগে, দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন। রাজা দশরথের রাজত্বের সীমানাটি খুব ছোটখাট ছিল না। তার পরিধি ছিল লম্বায় পঞ্চাশ ক্রোশ, আর চওড়ায় ছিল বারো ক্রোশেরও বেশী। এই রাজ্যের অধিবাসীরা পরম সুখে বাস করত। তাদের কোন অভাবও ছিল না, অভিযোগও ছিল না। তার কারণ, রাজা দশরথ প্রজাদের খুব ভালবাসতেন। রাজার কল্যাণে অযোধ্যার প্রজারা ছিল পরমসুখী।

রাজধানী অযোধ্যা ছিল চারদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা। আর এই পাঁচিলের

পাশ দিয়ে গভীর পরিখা খনন করা ছিল। যাতে শত্রুরা সহসা রাজধানী আক্রমণ করতে না পারে। রাজধানী অযোধ্যাকে যেমন সুরক্ষিত করে রাখা হয়েছিল, তেমনি সুন্দর করে সাজিয়ে তোলা হয়েছিল। এক কথায় বলা যেতে পারে, অযোধ্যা নগরীকে দেখবার মত করে গড়ে তোলা হয়েছিল।

রাজা দশরথ ছিলেন বিচক্ষণ, বুদ্ধিমান, সত্যবাদী ও ধার্মিক প্রকৃতির মানুষ। সেই সঙ্গে তাঁর বীরত্বও বড় কম ছিল না। কিন্তু তাই বলে, তিনি নিজে যা ভাল বুঝতেন তাই করতেন না। রাজকার্য পরিচালনা করার জন্য তিনি একটি মন্ত্রীসভা তৈরী করেছিলেন। এই মন্ত্রীসভায় সুমন্ত, জয়ন্ত, বিজয়, অশোক, রাষ্ট্রবর্ধন, সুরাষ্ট্র, ধৃতি ও ধর্মপাল নামে আটজন মন্ত্রী ছিলেন। রাজ্য পরিচালনার কাজে মন্ত্রীদের যেমন দক্ষতা ছিল, তেমনি আন্তরিকতাও ছিল। তাই এ রাজ্যের অধিবাসীদের কোন অভাব অভিযোগও ছিল না। সকলেই সুখে শান্তিতে বসবাস করত। চুরি বা ডাকাতি প্রভৃতি কোন অন্যায় কাজ এ রাজ্যের প্রজারা করত না। অযোধ্যা রাজ্যে সর্বদাই শান্তি ও শৃঙ্খলা বিরাজ করতো। কিন্তু তবুও রাজা দশরথের মনে সুখ ছিল না। কারণ, রাজা দশরথের কোন ছেলে ছিল না।

কৌশল্যা, কৈকেয়ী আর সুমিত্রা নামে রাজার তিন রাণী ছিলেন। রাণীদের মধ্যে খুব ভাব-ভালবাসা ছিল। রাজঅন্তঃপুরে সুখে ও শান্তিতে তাঁদের দিনগুলি কেটে গেলেও, পুত্র-সন্তানের অভাবে মনে শান্তি ছিল না।

একদিন রাজা দশরথ তাঁর মন্ত্রীসভায় এই মনোকষ্টের কথা বললেন। সেদিনের মন্ত্রীসভায় রাজা দশরথের কুল-পুরোহিত মহর্ষি বশিষ্ঠও উপস্থিত ছিলেন। পুত্রলাভের জন্য দশরথ তাঁর কাছে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন। মহর্ষি বশিষ্ঠ দশরথকে বললেন—"অশ্বমেধ যজ্ঞ করার আপনি যথার্থ অধিকারী। তবে এই যজ্ঞ করতে হলে, উপযুক্ত পুরোহিতের প্রয়োজন।"

বশিষ্ঠের কথা শুনে, রাজা দশরথ তাঁর ওপরই একজন যোগ্য পুরোহিত খুঁজে বার করার ভার দিলেন। কিছুক্ষণ চিন্তা করে, বশিষ্ঠ ঋষ্যশৃঙ্গ মুনির নাম বললেন। মন্ত্রী-সভার সদস্য সুমন্ত্র ঋষ্যশৃঙ্গের নাম শুনে বড়ই খুশী হয়ে উঠলেন। তিনি দশরথকে

জানালেন যে, অঙ্গদেশে একসময় অনাবৃষ্টি হলে, সেখানকার রাজা লোমপাদ কৌশল করে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিজের রাজ্যে নিয়ে আসেন। ঋষ্যশৃঙ্গ অঙ্গরাজ্যে এসে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রবলভাবে বৃষ্টি হতে থাকে। পরে রাজা লোমপাদ তাঁর কন্যা শান্তার সঙ্গে ঋষ্যশৃঙ্গের বিবাহ দেন। সুমন্ত্রের কাছে ঋষ্যশৃঙ্গের কাহিনী শুনে, রাজা দশরথ এবং তাঁর মন্ত্রীরা সকলেই একসঙ্গে বলে উঠলেন—এই রকম বৃহৎ যজ্ঞে ঋষ্যশৃঙ্গই পৌরোহিত্য করার উপযুক্ত ব্যক্তি।

অঙ্গদেশের রাজা লোমপাদের সঙ্গে দশরথের খুব বন্ধুত্ব ছিল। তাই তিনি নিজেই গেলেন লোমপাদের কাছে ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে আসার জন্য। যাবার সময় দশরথ মন্ত্রীদের ওপর যজ্ঞের আয়োজন করার ভার দিয়ে গেলেন। মন্ত্রীরা সরযূ নদীর তীরে যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে যজ্ঞশালা তৈরী হলো। দূর-দূরান্ত থেকে মুনি-ঋষিরা এবং ব্রাহ্মণেরা আসতে লাগলেন। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে নানা দেশ থেকে নানা মানুষ যজ্ঞস্থানে উপস্থিত হলো। যথাসময়ে রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গকে নিয়ে অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

কিভাবে অশ্বমেধ যজ্ঞ করতে হবে সে সম্পর্কে রাজা দশরথ ঋষ্যশৃঙ্গের কাছে জানতে চাইলেন। ঋষ্যশৃঙ্গ বললেন—'অশ্বমেধ যজ্ঞে ঘোড়ার মাংসের প্রয়োজন হয়।' প্রথমে একটি সুলক্ষণযুক্ত ঘোড়ার মাথায় জয়পত্র লিখে ছেড়ে দিতে হবে। সেই ঘোড়াটি বিভিন্ন রাজ্য ঘুরে, এক বছর পরে ফিরে আসবে। কিন্তু ঘোড়াটিকে কেউ যাতে আটকে রাখতে না পারে, তার জন্য ঐ ঘোড়ার সঙ্গে সৈন্য-সামন্ত, পাইক-বরকন্দাজ পাঠাতে হবে। এক বছর পরে ঐ ঘোড়া অযোধ্যায় ফিরে এলে ঘোড়াটিতে কেটে, তার মাংস দিয়ে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' করা হবে।

ঋষ্যশৃঙ্গের আদেশমত সৈন্য-সামন্ত ও পাইক-বরকন্দাজের সঙ্গে যজ্ঞের ঘোড়া ছেড়ে দেওয়া হলো। নানা দেশ ঘুরে, যজ্ঞের ঘোড়া এক বছর পরে অযোধ্যায় ফিরে এলো। ঘোড়াটি ফিরে আসতেই খুব ধূমধাম করে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' শুরু হলো। এইভাবে 'অশ্বমেধ যজ্ঞ' শেষ হলে, ঋষ্যশৃঙ্গ দশরথকে জানালেন যে, এবার

আপনাকে 'পুত্রেষ্টি যজ্ঞ' করতে হবে। এই যজ্ঞ করলে, নিশ্চয়ই আপনি পুত্রসন্তান লাভ করবেন। ঋষ্যশৃঙ্গের কথামত রাজা দশরথ 'পুত্রেষ্টি যজ্ঞের'-ও আয়োজন করলেন।

'পুত্রেষ্টি যজ্ঞ' আরম্ভ হলো!...যজ্ঞ যখন প্রায় শেষ হয়ে এসেছে, তখন সেই যজ্ঞের লকলকে আগুন থেকে লাল চেলীপরা এক কালো রঙের মহাপুরুষ বেরিয়ে এলেন। তাঁর হাতে একখানি পায়সের থালা। মহাপুরুষ সেই থালাটি রাজা দশরথের হাতে তুলে দিয়ে বললেন—"মহারাজ! স্বর্গ থেকে ব্রহ্মা এই পায়স আপনার জন্য পাঠিয়েছেন। রাণীদের এই পায়স আপনি খেতে দিন।" এই কথা ক'টি বলেই মহাপুরুষ অদৃশ্য-লোকে মিলিয়ে গেলেন।

থালাখানি হাতে নিয়ে, পরমানন্দে রাজা দশরথ রাজ অন্তঃপুরে চলে গেলেন। রাণীরা রাজার হাত থেকে পায়স নিয়ে, পরম পরিতৃপ্তিতে ভাগ করে খেলেন।

এর কিছুকাল পরে, অযোধ্যার রাজপ্রাসাদ থেকে সহসা একদিন ঘন ঘন শাঁখের আওয়াজ ও উলুধ্বনি শোনা গেল। সে ধ্বনি শুনে, প্রজারা ঘর ছেড়ে বেরিয়ে এলো। রাজপ্রাসাদ থেকে ঘোষণা করা হলো—'রাণীরা পুত্রসন্তান লাভ করেছেন। বড়রাণী কৌশল্যা আর মেজরাণী কৈকেয়ীর একটি করে পুত্রসন্তান জন্মগ্রহণ করেছে, আর ছোটরাণী সুমিত্রার পুত্রসন্তান হয়েছে—দুটি। শিশুপুত্রেরা অপরূপ রূপ নিয়ে মায়ের কোল আলো করে এসেছে। শিশুদের দেখে সকলের মন খুশীতে ভরে গেল। অযোধ্যার রাজপুরীর অনেককালের আশা-আকাঙ্ক্ষা এতদিনে পূর্ণ হলো। আনন্দ-উৎসবে মুখরিত হয়ে উঠলো—রাজা দশরথের সমগ্র রাজ্য। রাজা দশরথের 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ ও 'পুত্রেষ্টি' যজ্ঞ করা সার্থক হলো। আর এই উপলক্ষে রাজার ভাণ্ডার থেকে মুক্ত হস্তে টাকা-পয়সা, চাল-ডাল, জামা-কাপড় দান করা হলো অযোধ্যার দীন দুঃখী প্রজাদের। প্রজারা শিশুপুত্রদের সুদীর্ঘ জীবন ও মঙ্গল কামনা করতে করতে মহানন্দে ফিরে গেল।

শিশুপুত্রদের জন্মের এগারো দিন পরে, মহর্ষি বশিষ্ঠ তাদের নামকরণ করলেন।

বড়রাণী কৌশল্যার পুত্রের নাম রাম, মেজরাণী কৈকেয়ীর পুত্রের নাম ভরত ও ছোটরাণী সুমিত্রার দুই পুত্রের নাম রাখা হলো—লক্ষ্মণ আর শত্রুঘ্ন।

দিন যায়—মাস যায়, রাজপুত্রেরা রূপে-গুণে বড় হতে থাকেন। চার ভাইয়ের মধ্যে খুব ভাব-ভালবাসা। কেউ কাউকে ছেড়ে থাকতে পারে না। এর মধ্যে আবার
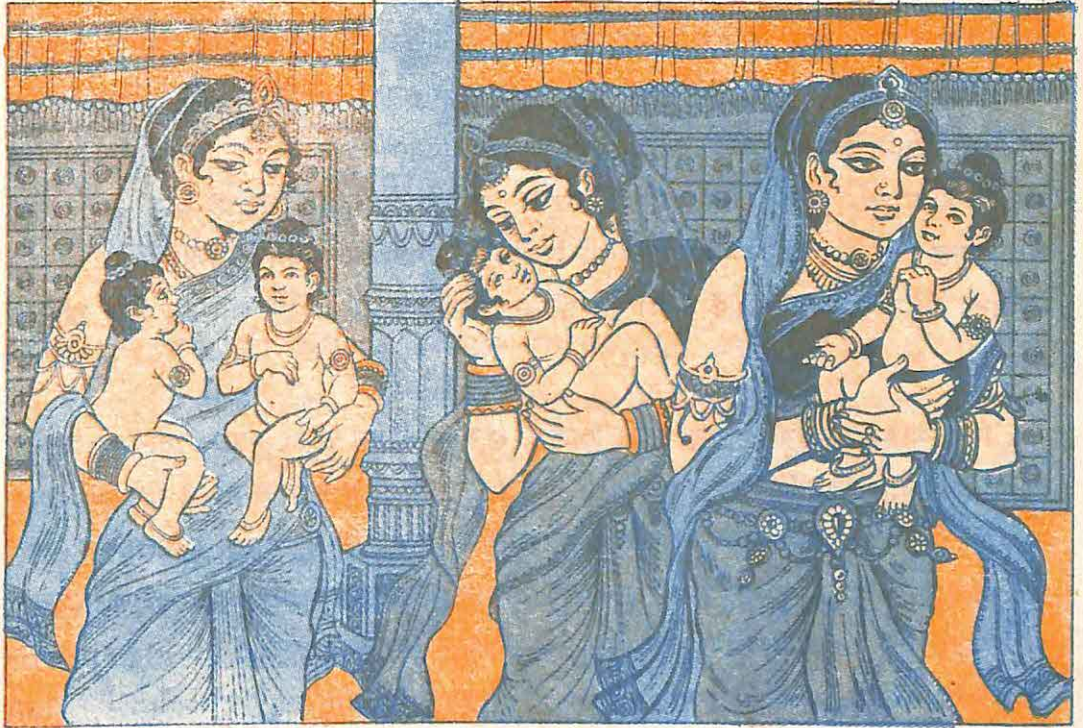
লক্ষ্মণ রামকে একটু বেশী ভালবাসতো। আর শত্রুঘ্ন ভালবাসতো ভরতকে। বড় হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে রাজা দশরথ রাজকুমারদের নানারকম শাস্ত্র এবং অস্ত্র শিক্ষার ব্যবস্থা করলেন। অল্পদিনের মধ্যেই দশরথের পুত্রেরা লেখাপড়ায় ও অস্ত্র চালনায় পারদর্শী হয়ে উঠলো।

একদিন রাজা দশরথ রাজসভায় পুত্রদের বিবাহ দেওয়া সম্পর্কে মন্ত্রীদের সঙ্গে পরামর্শ করছেন, এমন সময় হঠাৎ ঋষি বিশ্বামিত্র সেখানে এসে উপস্থিত হলেন।

বিশ্বামিত্র ছিলেন কড়া মেজাজের জেদী মানুষ। হঠাৎ তাঁর এই আগমনে সকলেই একটু ভয় পেয়ে গেলেন এবং ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। রাজা দশরথ সিংহাসন থেকে নেমে এসে, তাঁকে প্রণাম করলেন। অযোধ্যার রাজসভায় কি উদ্দেশ্যে তাঁর আগমন জানতে চাইলেন। উত্তরে বিশ্বামিত্র বললেন—"মহারাজ! আমি বড় বিপন্ন হয়েই আপনার কাছে এসেছি। লঙ্কার রাজা রাবণের অনুচর মারীচ আর সুবাহুর অত্যাচারে আমার যজ্ঞ নষ্ট হতে বসেছে। এই দুই রাক্ষস যজ্ঞস্থলে রোজ হাড় মাংস ফেলে, যজ্ঞস্থলকে কলুষিত করছে, যজ্ঞ পণ্ড করে দিচ্ছে।" ঋষির কথায় রাজা দশরথ সবিনয়ে জানালেন—"এখন আমার ওপর কি আদেশ বলুন? আপনার আদেশ আমি সাধ্যমত পালন করবো।" রাজার কথায় বিশ্বামিত্র সন্তুষ্ট হয়ে বললেন—"আপনার পুত্র রাম যুদ্ধবিদ্যায় পারদর্শী হয়েছে। রাক্ষসদের বধ করবার জন্য আমি রামকে নিয়ে যেতে এসেছি। আপনি দিনকয়েকের জন্য রামকে আমার সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।"

বিশ্বামিত্রের কথায় দশরথ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং ভয় পেয়ে গেলেন। তিনি সবিনয়ে বিশ্বামিত্রকে বললেন—"রাম ছেলেমানুষ, যুদ্ধে রাক্ষসদের কি সে পরাস্ত করতে পারবে? তার চেয়ে আমি বরং অক্ষৌহিনী সেনা নিয়ে গিয়ে রাক্ষসদের সঙ্গে যুদ্ধ করবো। আর যদি আপনি একান্তই রামকে নিয়ে যেতে চান, তবে চতুরঙ্গ সেনার সঙ্গে বরং আমাকেও নিন।" রাজা দশরথের কথায় বিশ্বামিত্র ক্ষুণ্ণ হলেন। বললেন—"মহারাজ! আপনি আগেই প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন, আমার আদেশ সাধ্যমত পালন করবেন। এখন সে প্রতিশ্রুতি যদি রাখতে না চান তো বলুন, আমি ফিরে যাই।" বিশ্বামিত্রের কথায় দশরথ চঞ্চল হয়ে উঠলেন। শেষে বশিষ্ঠ দশরথকে বুঝিয়ে বললেন যে—"বিশ্বামিত্র একাই রাক্ষসদের বধ করতে পারেন। কিন্তু তিনি নিজে রাক্ষসদের বধ না করে, রামকে নিতে আসার কারণ সম্পর্কে আমার মনে হয়, রামের মঙ্গলের জন্যই ঋষি রামকে নিতে এসেছেন। আপনি নির্ভাবনায় রামকে ওঁর সঙ্গে পাঠিয়ে দিন।" মহর্ষি বশিষ্ঠের কথায় অনিচ্ছাসত্ত্বেও শেষ পর্যন্ত

রাজা দশরথ রামকে বিশ্বামিত্রের সঙ্গে যাবার অনুমতি দিলেন। রামকে ছেড়ে লক্ষ্মণ থাকতে চাইলেন না, তিনিও তাঁর সঙ্গে গেলেন। রাম-লক্ষ্মণকে বিদায় দিয়ে, রাজা এবং রাণীরা ও রাজপরিবারের সকলেই ভয় ভাবনায় দিন কাটাতে লাগলেন।

বিশ্বামিত্রকে অনুসরণ করে রাম-লক্ষ্মণ নানান পথ দিয়ে হেঁটে হেঁটে চললেন। তাঁদের দু'ভাইয়ের হাতে ধনুর্বাণ ও খড়্গ। তাঁরা বীরদর্পে, নির্ভীক চিত্তে চললেন— পথ আলো করে। এইভাবে চলতে চলতে সরযূ নদী পার হয়ে, তাঁরা এক গভীর অরণ্যে প্রবেশ করলেন। এই অরণ্যে তাড়কা নামে এক ভয়ঙ্করী রাক্ষসী বাস করত। ব্রহ্মার বরে সে সহস্র হাতীর শক্তি লাভ করেছিল, আর স্বভাবেও সে ছিল খুব হিংস্র। তার সামনে কেউ পড়লে, তার আর রেহাই ছিল না। সঙ্গে সঙ্গে তাকে খেয়ে ফেলতো। রাম-লক্ষ্মণকে এই বনে দেখতে পেয়ে, একটা বিরাট হাঁ করে সে ঝড়ের বেগে ছুটে এলো। তা দেখে, বিশ্বামিত্র তাড়কাকে ভর্ৎসনা করলেন। রাম দেখলেন, এই রাক্ষসীর হাত থেকে নিস্তার পেতে হলে, অস্ত্রচালনা করা ছাড়া উপায় নেই। রাম বাণ নিক্ষেপ করে, প্রথমে তার হাত দুটো কেটে দিলেন। লক্ষ্মণও সেই সঙ্গে আর এক বাণে তাকে বিঁধে ফেললেন। কিন্তু তাতেও সেই ভয়ঙ্করী রাক্ষসী মাটিতে লুটিয়ে পড়লো না। বিরাট হাঁ করে রাম-লক্ষ্মণের দিকে তেড়ে এলো। তখন রাম তাড়কাকে লক্ষ্য করে আর এক বাণ ছুঁড়লেন। সেই বাণ তাড়কার বুকে গিয়ে বিঁধলো। তাড়কা আকাশে ধূলো উড়িয়ে, বিকট চিৎকার করতে করতে মাটিতে লুটিয়ে পড়লো। রাম-লক্ষ্মণের সাহস ও বীরত্বে বিশ্বামিত্র খুশী হলেন।

পরের দিন সকালে বিশ্বামিত্রের আদেশে রামচন্দ্র সরযূ নদী থেকে স্নান করে এলে, বিশ্বামিত্র 'বলা' আর 'অতিবলা' নামে তাঁকে দু'টি মন্ত্র দান করলেন। এই মন্ত্র লাভ করে রামচন্দ্রের দেহের বল আরও বেড়ে গেল। আর সেইসঙ্গে তৃষ্ণা বা ক্ষুধার জন্যে তাঁর আর কোন কষ্ট রইলো না।

এরপর রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে বিশ্বামিত্র তাঁর আশ্রমে ফিরে এলেন। বিশ্বামিত্রের যে যজ্ঞ রাক্ষসদের অত্যাচারে বার বার পণ্ড হচ্ছিল, বিশ্বামিত্র আবার সেই যজ্ঞের আয়োজন করলেন। রাম-লক্ষ্মণ পাহারায় রইলেন। সবেমাত্র যজ্ঞ আরম্ভ হয়েছে, এমন সময় কোথা থেকে আবার সেই মারীচ আর সুবাহু রাক্ষস যজ্ঞ পণ্ড করার জন্য তেড়ে এলো। রাক্ষসদের আক্রমণ করার জন্য রাম-লক্ষ্মণ প্রস্তুত হয়েই ছিলেন। তারা আসার সঙ্গে সঙ্গেই রাম তাদের লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়লেন। রামের বাণে আহত হয়ে মারীচ ঘুরতে ঘুরতে সমুদ্রের ধারে গিয়ে আছাড় খেয়ে পড়লো। লক্ষ্মণও সঙ্গে সঙ্গে সুবাহুকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়লেন, বাণবিদ্ধ হয়ে সুবাহু সেইখানেই পড়ে রইলো। এরপর বিশ্বামিত্র নিশ্চিন্ত মনে আবার যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। বিশ্বামিত্র ও অন্যান্য মুনি-ঋষিরা রাম-লক্ষ্মণের বীরত্বে খুশী হয়ে তাদের আশীর্বাদ করলেন আর সেই সঙ্গে দুই ভাইকে নানারকম অস্ত্র-শস্ত্র দান করলেন।

এই সময়ে মিথিলার রাজা জনক এক যজ্ঞ করছিলেন। বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে সেই যজ্ঞ দেখানোর জন্য মিথিলার পথে যাত্রা করলেন। কত গভীর বন-জঙ্গল, গ্রাম, পাহাড়, নদ-নদী পেরিয়ে রাম-লক্ষ্মণ বিশ্বামিত্রকে অনুসরণ করে পথ চলতে লাগলেন। এইভাবে অনেক দূর যাওয়ার পর, এক গভীর জঙ্গলের মধ্যে তাঁরা একটি সুন্দর আশ্রম দেখতে পেলেন। কিন্তু আশ্চর্য! এই আশ্রমের ত্রিসীমানায় কোন জন-মনিষ্যি নেই। কেমন যেন একটা থম্‌থমে ভাব। রামচন্দ্র আশ্রমটি দেখে মনের কৌতূহল আর চেপে রাখতে পারলেন না। বিশ্বামিত্রকে জিজ্ঞাসা করলেন—'এটি কোন মুনির আশ্রম?' বিশ্বামিত্র উত্তরে জানালেন—'এটি গৌতম মুনির আশ্রম।' গৌতমের স্ত্রী অহল্যা এমন এক অপরাধ করেছিলেন, যার জন্যে গৌতম তাঁর স্ত্রী অহল্যাকে ত্যাগ করে, আশ্রম ছেড়ে কৈলাসে চলে গিয়েছেন। বিশ্বামিত্রের কথায় রামচন্দ্রের কৌতূহল আরও বেড়ে গেল। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন—

—গৌতমের স্ত্রী এখন কোথায়?

—গৌতমের স্ত্রী এখনো এখানেই আছেন। তবে তিনি এখন প্রাণহীনা, পাষাণী!

গৌতম আশ্রম ছেড়ে চলে যাবার সময়, অহল্যাকে অভিশাপ দিয়ে গেছেন যে, এইখানেই অহল্যা পাষাণ হয়ে থাকবে।

—অহল্যা কি সেই থেকে এখনো পাষাণ হয়েই আছেন ?

—হ্যাঁ। তাইতো এক বিশেষ উদ্দেশ্যে তোমাকে এই পথ দিয়ে মিথিলায় নিয়ে যাচ্ছি।

—কি সে উদ্দেশ্য ?

—গৌতম অহল্যাকে অভিশাপ দেবার সময় বলে গিয়েছিলেন, যতদিন না দশরথের পুত্র রামচন্দ্র এখানে আসবেন, ততদিন তোর মুক্তি নেই! তিনি এলে, তাঁর পূজা করলে, তবে তুই মুক্তিলাভ করবি। এখন সেই পাষাণ-প্রতিমা অহল্যাকে তুমি অভিশাপ মুক্ত কর।

অহল্যা বহুকাল প্রাণহীনা, নিশ্চল, পাষাণ হয়ে ছিলেন। আর একমনে রামেরই তপস্যা করছিলেন। বিশ্বামিত্রের নির্দেশে রাম পাষাণ স্পর্শ করার সঙ্গে সঙ্গে অহল্যা প্রাণ ফিরে পেলেন। প্রাণ ফিরে পেয়ে অহল্যা শ্রীরামচন্দ্রের পূজা করলেন। শ্রীরামচন্দ্রও অহল্যাকে প্রণাম জানালেন।

রামচন্দ্রের স্পর্শে অহল্যা প্রাণ ফিরে পেলেন

অভিশপ্তা অহল্যাকে উদ্ধার করার পর, রাম বিশ্বামিত্রের নির্দেশে আবার পথ চলতে শুরু করলেন।

মিথিলার রাজা জনক তখন তাঁর রাজসভায় রাজকার্য পরিচালনার কাজে ব্যস্ত। এমন সময় বিশ্বামিত্র রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত হলেন। রাজা জনক বিশ্বামিত্রকে সাদর অভ্যর্থনা জানালেন। বিশ্বামিত্র জনক রাজার সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় করিয়ে দিলেন এবং বললেন—'রাজা দশরথ তাঁর ছেলেদের শুধু সর্বশাস্ত্রে সুপণ্ডিত করেই তোলেননি, সেই সঙ্গে অস্ত্র চালনাতেও সুদক্ষ করে তুলেছেন। এরপর বিশ্বামিত্র তাড়কা রাক্ষসী বধ, মারীচকে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়া প্রভৃতি রামচন্দ্রের অসীম বীরত্ব কাহিনীর কথা জনক রাজার কাছে প্রকাশ করলেন।

রাজা জনক রাম-লক্ষ্মণের গুণপণার কাহিনী শুনে, খুবই খুশী হলেন। একসময় রাজা জনক এক প্রকাণ্ড ধনুক মহাদেবের কাছ থেকে লাভ করেছিলেন। মহাদেব এই ধনুক রাজা জনককে দিয়েছিলেন বলে, এর নাম হয়েছিল--"হরধনু"। রাজা জনক পণ করেছিলেন, যে এই হরধনুতে "গুণ" দিতে পারবে, তার সঙ্গে তিনি তাঁর পালিতা কন্যা সীতার বিবাহ দেবেন।

সীতার আবির্ভাবের একটি গল্প আছে। সে গল্পটি এই যে, জনক রাজা এক সময় যজ্ঞ করবেন বলে, যজ্ঞের স্থানটি লাঙ্গল দিয়ে চষছিলেন। এমন সময় লাঙ্গলের ফলার মুখে এক পরমাসুন্দরী কন্যার আবির্ভাব হলো। রাজা জনক পরম আদরে সেই কন্যাকে লালন-পালন করতে লাগলেন। আর লাঙ্গলের ফলার মুখে উঠেছিল বলে তার নাম রাখলেন--'সীতা'। কারণ, লাঙ্গলের ফলার রেখার নাম সীতা। দেবতার আশীর্বাদে জনকরাজা সেই কন্যাকে লাভ করেছিলেন বলে, তিনি পণ করেছিলেন-- দেবাদিদেব মহাদেবের দেওয়া ধনুকে যিনি "গুণ" দিতে পারবেন, তার সঙ্গেই তিনি সীতার বিবাহ দেবেন।

বিশ্বামিত্র রাজা জনককে অনুরোধ করলেন, রামচন্দ্রকে ধনুকটি একবার দেখানোর জন্য। বিশ্বামিত্রের অনুরোধে জনক রাজসভায় কয়েকজন লোক দিয়ে ঐ ধনুকটিকে আনালেন। যে ধনুকটি কয়েকজন লোকে অনেক কষ্টে বয়ে নিয়ে এলো, রামচন্দ্র একাই সেই ধনুকটি অনায়াসে হাতে তুলে নিলেন। তারপর সর্বশক্তি দিয়ে তাতে

গুণ দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে ধনুকটি ভেঙ্গে দু-টুকরো হয়ে গেল। রামচন্দ্রের এইরূপ শক্তি দেখে, রাজা জনক এবং তাঁর সভাসদরা অবাক হয়ে গেলেন। রাজা জনক খুশী হয়ে বিশ্বামিত্রকে জানালেন—রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার বিয়ে দিয়ে তিনি তাঁর প্রতিজ্ঞা রাখবেন।

এর পর রাজা জনক অযোধ্যার রাজা দশরথের কাছে দূত পাঠালেন। যথা সময়ে দূত অযোধ্যায় এসে—রাজা দশরথের কাছে সব কথা জানালো। দূতের মুখে রামচন্দ্রের বীরত্বের কাহিনী শুনে, আর সেই সঙ্গে রাজা জনক যে সীতার সঙ্গে রামচন্দ্রের বিয়ে দিতে চান এ কথা জেনে, মহা উল্লাসে রাজা দশরথ অন্তঃপুরে চলে গেলেন। রাণীদের সব কথা জানালেন তিনি। ছেলের বিয়ের কথায় রাণীদের আর আনন্দ ধরে না। দেখতে দেখতে সারা অযোধ্যায় কথাটা ছড়িয়ে পড়লো। রাজপুরী থেকে শুরু করে, রাজা দশরথের সমস্ত রাজ্য আনন্দে মেতে উঠ্‌লো।

রাজা দশরথ ভরত শত্রুঘ্ন আর কুলগুরু বশিষ্ঠকে সঙ্গে নিয়ে মিথিলায় যাত্রা করলেন। রাজা দশরথ আসছেন জেনে, জনক রাজা তাঁকে অভ্যর্থনা করে নিয়ে আসার জন্যে হাতী ঘোড়া, লোক-লস্কর এবং সৈন্য-সামন্ত পাঠিয়ে দিলেন। রাজা দশরথ মিথিলায় এসে পৌঁছোলেন। তারপর এক শুভলগ্নে উৎসব মুখরিত মিথিলার রাজপুরীতে রামচন্দ্রের সঙ্গে সীতার বিবাহ হয়ে গেল।

ঊর্মিলা, মাণ্ডবী আর শ্রুতকীর্তি নামে জনকরাজা ও তাঁর ভাই কুশধ্বজের তিনটি মেয়ে ছিল। জনকরাজা দশরথকে অনুরোধ করলেন, এই তিনটি মেয়েকে তাঁর অপর আর তিন পুত্রের সঙ্গে বিবাহ দেবার জন্যে। রাজা দশরথ জনক রাজার এ প্রস্তাব আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করলেন। আর এক শুভলগ্নে ভরতের সঙ্গে মাণ্ডবীর, লক্ষ্মণের সঙ্গে ঊর্মিলার আর শত্রুঘ্নের সঙ্গে শ্রুতকীর্তির বিবাহ হয়ে গেল।

রাজা দশরথের একসঙ্গে চার ছেলের বিয়ের খবর অযোধ্যায় গিয়ে পৌঁছোনোর সঙ্গে সঙ্গে সারা রাজ্য আনন্দে মেতে উঠলো। রাণীরা পুত্রবধূদের বরণ করে ঘরে তুলে নেওয়ার জন্যে উদ্‌যোগ আয়োজন করতে লাগলেন। রাজা জনক মেয়েদের বিবাহের যৌতুক স্বরূপ অনেক ধন-রত্ন, সেই সঙ্গে হাতী-ঘোড়া দান করলেন। রাজা দশরথ

পুত্র-পুত্রবধূদের নিয়ে অযোধ্যার পথে ফিরে চললেন। পথে তিনি বহু গরীব দুঃখীকে অনেক ধন-রত্ন দান করলেন। হঠাৎ ঘটলো এক অঘটন। মিথিলা থেকে অযোধ্যায় ফিরে আসার পথে সহসা কুঠার ও ধনুকধারী এক মহা শক্তিশালী ব্যক্তি তাঁদের পথরোধ করে দাঁড়ালেন। দশরথ এই ব্যক্তিকে চিনতে পারলেন। এঁর নাম 'পরশুরাম'। ইনি যেমন বীর, তেমনি একরোখা। এঁকে দেখে সকলেই ভয় পেয়ে গেল। রাম-লক্ষ্মণ কিন্তু একটুও ভয় পেলেন না। পরশুরাম সদম্ভে রামচন্দ্রের সম্মুখে এসে বললেন—"জনক রাজার ঘরে তুমি নাকি শিবের ধনুক ভেঙ্গে খুব বীরত্ব দেখিয়েছ ? এখন আমার এই ধনুকটিতে গুণ পরিয়ে বীরত্ব দেখাও দেখি ?" এই কথা বলে, পরশুরাম তাঁর ধনুকটি রাম-চন্দ্রের দিকে এগিয়ে দিলেন। পরশুরামের এই ব্যবহারে দশরথ একদিকে যেমন বিরক্ত হলেন, অন্যদিকে তেমনি খুবই ভয় পেয়ে গেলেন। পরশুরামের কাছে দশরথ অনেক আবেদন নিবেদন করলেন; কিন্তু পরশুরাম কোন কথাই কানে তুললেন না। রামচন্দ্র দেখলেন পরশুরামের কাছ থেকে নিস্তার পেতে হলে ধনুকে গুণ দেওয়া ছাড়া আর কোনও উপায় নেই। তখন তিনি বাধ্য হয়ে পরশুরামের ধনুকটি হাতে নিয়ে অতি সহজেই গুণ পরিয়ে দিলেন। রামচন্দ্রের অসীম শক্তি দেখে পরশুরাম বিস্মিত হয়ে গেলেন! এরপর শান্তভাবে রামচন্দ্র পরশুরামকে বললেন—"আপনার নির্দেশমত এই ধনুতে তো আমি গুণ পরালাম, এরপর আপনার আর কি আদেশ আছে বলুন ?"

রামচন্দ্র অনায়াসে পরশুরামের ধনুকে গুণ পরালেন

পরশুরাম এরপর আর কোন আদেশ তো করলেই না, উপরন্তু প্রাণভরে রামচন্দ্রকে আশীর্বাদ করলেন।

পরশুরামকে দেখে রাজা দশরথ যত ভয় পেয়েছিলেন, রামচন্দ্রের ক্ষমতা দেখে, সে ভয় নিমেষেই দূর হয়ে গেল। এবার রাজা দশরথ পুত্র-পুত্রবধূদের নিয়ে অযোধ্যায় প্রবেশ করলেন। শঙ্খধ্বনি ও উলুধ্বনির মাঝে পুত্র-পুত্রবধূদের বরণ করে ঘরে তুললেন রাণীরা। রাজপ্রাসাদ থেকে সারা অযোধ্যায় সেদিন সে কি আনন্দ! সে কি উৎসব! অযোধ্যাবাসীরা আনন্দে দিন কাটাতে লাগলো।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। "বহুকাল আগে দশরথ নামে এক রাজা ছিলেন।"—দশরথের রাজধানীর নাম কি? তাঁর রাজত্বের সীমানা ছিল কত? রাজ্যের অধিবাসীরা সুখে বাস করতো? প্রজারা কেন পরম সুখী ছিল? [২ + ৩ + ৩ + ২]

২। "রাজধানী অযোধ্যা ছিল চারিদিকে পাঁচিল দিয়ে ঘেরা।"—রাজধানী পাঁচিল দিয়ে ঘেরা ছিল কেন? পরিখা খনন করার উদ্দেশ্য কি? এক কথায় অযোধ্যাকে কিভাবে গড়ে তোলা হয়েছিল? [৩ + ৪ + ৩]

৩। "রাজকার্য পরিচালনা করার জন্য তিনি একটি মন্ত্রীসভা তৈরী করেছিলেন"—কে এই মন্ত্রীসভা তৈরী করেন? কেন তৈরী করেন? এই মন্ত্রীসভায় ক'জন মন্ত্রী ছিলেন? মন্ত্রীদের নাম কি ছিল? তাঁরা কেমন ছিলেন? রাজ্যের অধিবাসীরা সুখে শান্তিতে থাকতো কেন? [১ + ২ + ১ + ২ + ২ + ২]

৪। "পুত্র সন্তানের অভাবে মনে শান্তি ছিল না"—
কাদের মনে শান্তি ছিল না? তাদের পরিচয় কি? [২ + ২]

৫। "পুত্রলাভের জন্য রাজা দশরথ 'অশ্বমেধ' যজ্ঞ করার ইচ্ছা প্রকাশ করলেন"—
কাদের কাছে দশরথ ইচ্ছা প্রকাশ করলেন? সেখানে কে কে উপস্থিত ছিলেন? [২ + ২]

৬। "রাজা দশরথ তাঁর উপরেই একজন যোগ্য পুরোহিত খুঁজে বার করার ভার দিলেন।"—

রাজা দশরথ কার উপর ভার দিলেন? তিনি কে ছিলেন? যোগ্য পুরোহিত হিসাবে তিনি কার নাম বলেন? [২ + ২ + ২]

৭। "পুত্রেষ্টি যজ্ঞ আরম্ভ হলো"।

পুত্রেষ্টি যজ্ঞ কোথায় আরম্ভ হলো? কখন আরম্ভ হলো? কার কথায় এই যজ্ঞ আরম্ভ হলো? [২ + ৩ + ২]

৮। "তাঁর হাতে একখানি পায়সের থালা।"—

কার হাতে পায়সের থালা ছিল? তিনি কোথা থেকে এলেন? কার কাছ থেকে এলেন? কোন সময় এলেন? তাঁর চেহারাটা কেমন? [২ + ২ + ২ + ২ + ২]

৯। "রাজপ্রাসাদ থেকে ঘোষণা করা হলো—রাণীরা পুত্রসন্তান লাভ করেছেন।"

কোন রাণী ক'টি সন্তান লাভ করলেন? [৩]

১০। "বিশ্বামিত্রের কথায় দশরথ খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন এবং ভয় পেয়ে গেলেন।"—

দশরথ চিন্তিত হলেন কেন? বিশ্বামিত্র তাঁকে কি বলেছিলেন? কেন তিনি রামচন্দ্রকে নিতে এসেছিলেন? [৩ + ৩ + ৩]

১১। "সীতার আবির্ভাবের একটি গল্প আছে।"

গল্পটি কি? [৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "শিশুপুত্রদের জন্মের এগারো দিন পরে মহর্ষি বশিষ্ঠ তাদের নামকরণ করলেন"—তিনি কার, কি নামকরণ করলেন? [২]

২। "গৌতমের স্ত্রী এখন কোথায়?"

কে এই প্রশ্ন করলেন? কাকে প্রশ্ন করলেন? তিনি কি উত্তর দিলেন? [২ + ২ + ২]

৩। "অহল্যা বহুকাল প্রাণহীনা, নিশ্চল পাষাণ হয়েছিলেন"—

কেন পাষাণ হয়েছিলেন? কিভাবে তিনি শাপমুক্ত হলেন? পাষাণ হয়ে অহল্যা কি করছিলেন? [৩ + ৩ + ৩]

অযোধ্যা কাণ্ড

চার ছেলের বিয়ে দিয়ে, রাজা দশরথ মনের সুখে রাজ্য পরিচালনা করতে লাগলেন। অযোধ্যার প্রজাদের সুখ-সুবিধা ও স্বাচ্ছন্দ্যের দিকে রাজা দশরথ সব সময়েই নজর রাখতেন ; তাই প্রজারাও সর্বদাই রাজার মঙ্গলকামনা করতো। আনন্দে উৎসবে রাজা দশরথের রাজত্ব সব সময়ে মুখর হয়ে থাকতো। এই ভাবে দিন যায়—মাস যায়—বছর যায়। রাজা দশরথ একদিন মন্ত্রীদের ডেকে বললেন—"আমি এখন বুড়ো হয়ে পড়েছি। তাই ভাবছি, রাজকার্য পরিচালনার ভার আমার বড় ছেলে রামের ওপর দিয়ে, জীবনের শেষ দিনগুলো ধর্মে-কর্মে কাটিয়ে দেব।" রাজার কথা শুনে মন্ত্রীরা সকলেই তাতে সম্মতি
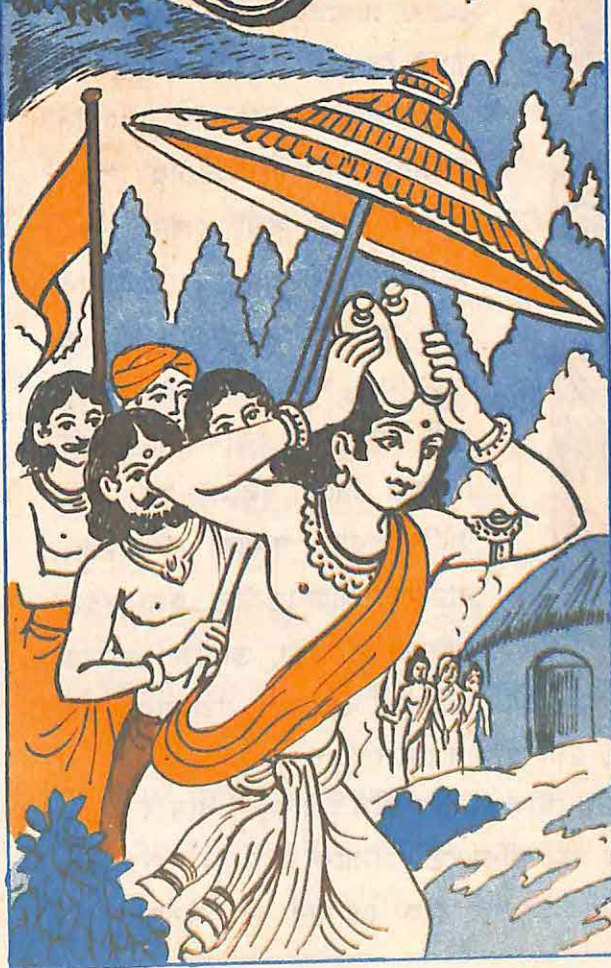
জানালেন। সঙ্গে সঙ্গে রামচন্দ্রের অভিষেকের দিনও ঠিক হয়ে গেল।

দশরথ অবসর গ্রহণ করবেন এবং রামচন্দ্র রাজা হবেন, অল্প সময়ের মধ্যে এ খবর সারা রাজ্যে ছড়িয়ে পড়লো। অভিষেকের উৎসব আয়োজন চলতে লাগলো। হঠাৎ এই আনন্দের মাঝে ঘটলো এক অঘটন। মেজরাণী কৈকেয়ীর এক দাসী ছিল। তার নাম 'মন্থরা'। মন্থরা দেখতে ছিল কুৎসিৎ। তার পিঠে ছিল একটা মস্ত বড় কুঁজ আর স্বভাব ছিল ভারী হিংসুটে। তাই লোকে তাকে কুঁজী বলে ডাকতো। রামচন্দ্র রাজা হচ্ছে শুনে, সে হিংসায় জ্বলে যেতে লাগলো। সঙ্গে সঙ্গে মেজরাণী কৈকেয়ীর কাছে গিয়ে, সে রামের রাজা হওয়ার খবরটা দিলো। কৈকেয়ী মন্থরার কাছে কথাটা শুনে খুশী হলেন। এই সুসংবাদ দেওয়ার জন্যে গলার হার খুলে মন্থরাকে পুরস্কৃত করলেন। মন্থরা কিন্তু হার পেয়ে খুশী হলো না। কৈকেয়ীর হারটা ফিরিয়ে দিয়ে বললে—"এ হার আমি পরতে পারবো না মেজরাণীমা। আজ তোমার ছেলে ভরত যদি রাজা হতো, তাহলে তোমার দেওয়া এ হার আমি আনন্দে গলায় পরতাম।" কৈকেয়ী বললেন—"আমার কাছে ভরতও যা—রামও তা। আমি ওদের মা, ওরা আমার ছেলে।"

মন্থরা কৈকেয়ীকে কুমন্ত্রণা দিচ্ছে

—"তা বটে, তবে ভরত তোমার পেটের ছেলে। কিন্তু রাম তো নয়—রাম তোমার সৎ ছেলে, তুমি তার সৎমা! ধরো, রাম যদি ভবিষ্যতে তোমাকে না দেখে? ভরতকে যদি তার ন্যায্য বিষয় সম্পত্তি থেকে বঞ্চিত করে? তাহলে তোমার কি উপায় হবে

ভেবে দেখেছ কি ?" এই ভাবে মন্থরা অনেক কু-মন্ত্রণা দিয়ে কৈকেয়ীর মনটা ভেঙ্গে দিলে। তিনি সাত পাঁচ ভাবতে লাগলেন, শেষে মন্থরাকে বললেন—"তাহলে এখন কি উপায় করি বলো তো ?" মন্থরা দেখলে রাণীর মন বিষিয়ে উঠেছে ; তার মন্ত্রণার ফল ফলতে আরম্ভ করেছে। তখন সে বললে—"একবার অসুরদের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে রাজা দশরথ আহত হয়েছিলেন, সে সময় তুমিই তাঁকে সেবা শুশ্রূষা করে সারিয়ে তুলেছিলে। তোমার সেবা শুশ্রূষায় সন্তুষ্ট হয়ে রাজা সে সময় তোমাকে দু'টি বর দিতে চেয়েছিলেন। এই সময়ে রাজার কাছ থেকে তুমি সেই বর দু'টি চেয়ে নাও।" কৈকেয়ী মন্থরাকে জিজ্ঞেস করলেন—"কি বর চাইব আমি ?" মন্থরা জানাল—"এক বরে রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছরের জন্যে বনবাসে পাঠাতে চাইবে, আর এক বরে ভরতকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসানোর জন্যে রাজাকে বলবে।" মন্থরার কথা শুনে, কৈকেয়ী অবাক হয়ে গেলেন। ভরতকে রাজসিংহাসনে বসানোর মধ্যে না হয় একটা স্বার্থ জড়িত আছে, কিন্তু রামচন্দ্রকে চৌদ্দ বছরের জন্যে বনবাসে পাঠানোর উদ্দেশ্য কি ?

মন্থরা বুঝতে পারলো কৈকেয়ীর মনের কথা। তখন সে কৈকেয়ীকে বললে—"তুমি যা ভাবছ, আমি তা বুঝতে পেরেছি। রামকে চৌদ্দ বছর বনে পাঠাতে কেন বললাম—এই তো ?" উত্তরে কৈকেয়ী বললে—"হ্যাঁ, আমিও ঠিক ঐ কথাই ভাবছিলাম।" তখন মন্থরা রামকে বনে পাঠানোর উদ্দেশ্য বুঝিয়ে বলতে লাগলো। "রাম যদি এই অযোধ্যাতেই থাকে, আর ভরত রাজা হয়, তাহলে অযোধ্যার প্রজারা কিছুতেই তা মেনে নেবে না। হয়তো বা প্রজারা ভরতের বিরুদ্ধেই যাবে। তাই বলছিলাম রামকে বনে পাঠাবার ব্যবস্থা কর। তাহলে আর কোন গণ্ডগোল হবে না।"

মন্থরার এই যুক্তি কৈকেয়ী মনে প্রাণে মেনে নিলেন। এরপর মন্থরা ঘর ছেড়ে চলে গেল।

অনেক ভেবেচিন্তে কিছুক্ষণ পরে কৈকেয়ী দশরথকে নিজের ঘরে ডেকে আনালেন। একথা সেকথার পর, রাজা দশরথকে মনে করিয়ে দিলেন যে, একসময় তিনি তাঁকে দু'টি বর দিতে চেয়েছিলেন। কৈকেয়ীর কথা শুনে দশরথ বললেন—"হ্যাঁ চেয়েছিলাম

তো, ইচ্ছে করলে সে বর দু'টি তুমি যে কোন সময়ে চেয়ে নিতে পার।" দশরথের কথা শুনে কৈকেয়ী তখুনি বর দু'টি চেয়ে বসলেন। এক বরে ভরতকে রাজা করা, অন্য বরে রামকে বনবাসে পাঠানো। কৈকেয়ীর কথা শুনে, রাজা দশরথ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। চোখে অন্ধকার দেখতে লাগলেন। মনে হলো, এই মুহূর্তে সংসারটা যেন ভেঙ্গে চুরমার হয়ে গেল, তিনি মূছিত হয়ে পড়লেন।
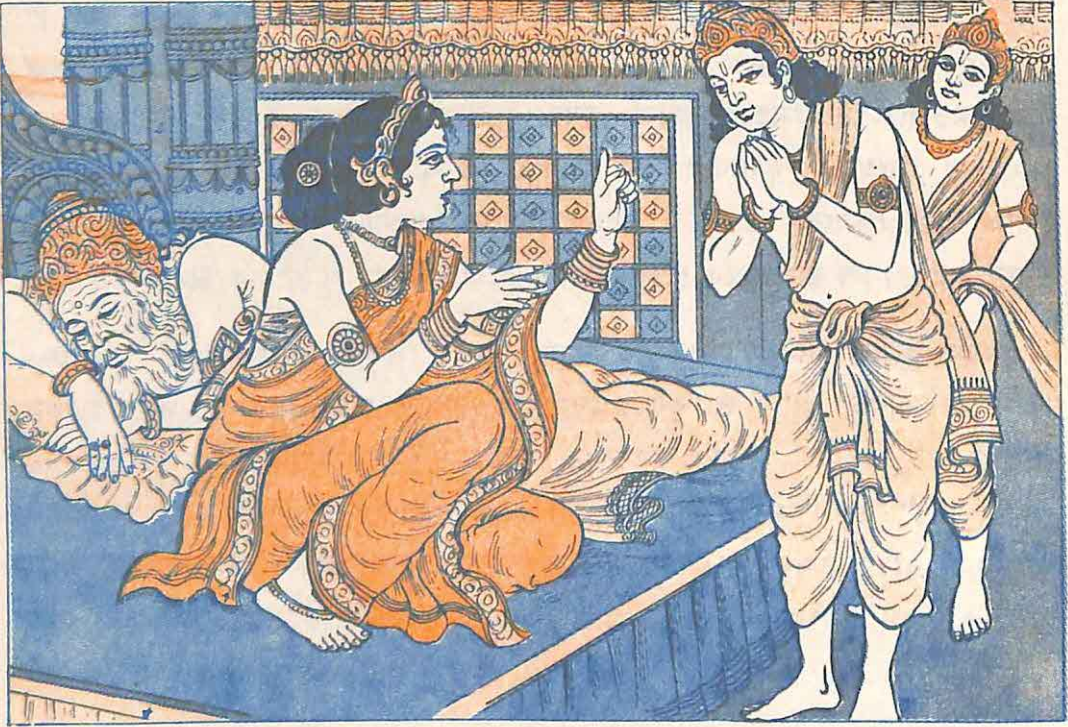
বনবাসের কথা শুনে দশরথ মূর্চ্ছা গেলেন

রাজার মূর্চ্ছা যাবার খবর শুনে রামচন্দ্র আর সেই সঙ্গে রাজবাড়ীর সকলেই ছুটে এলেন। রাজার কেন এমন হলো? তাই নিয়ে সকলেই জল্পনা-কল্পনা করতে লাগলেন। কৈকেয়ীকে রামচন্দ্র জিজ্ঞেস করলেন--"পিতা কি করে জ্ঞান হারালেন

মেজ মা ?" কৈকেয়ী রামের কাছে আসল কথাটা চেপে গিয়ে জানালেন—"রাজার ইচ্ছা ভরতকে রাজসিংহাসনে বসানো, আর তোমাকে চৌদ্দ বছরের জন্যে বনবাসে পাঠানো। কিন্তু রাজা লজ্জায় সে কথাটা তোমাকে বলতে পারছেন না। মনের কথাটা চেপে রেখে অনেকদিন ধরেই মনের দুঃখে দিন কাটাচ্ছিলেন। আজ হঠাৎ আমার সঙ্গে সেই কথা বলতে বলতে অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।" কৈকেয়ীর কাছে সব কথা শুনে রামচন্দ্র বললেন—"বাবার জীবনের চেয়ে তাঁর সিংহাসন আমার কাছে বড় নয়—আমি বনবাসেই যাবো।"

কিছুক্ষণ পরে রাজা দশরথের জ্ঞান ফিরে আসতে, রাম তাঁর মনের কথা রাজাকে জানালেন। বললেন—"আপনি ভরতের রাজ্যাভিষের আয়োজন করুন। আমি চৌদ্দ বছরের জন্যে বনবাসেই যাবো।"

অযোধ্যায় রামচন্দ্রের রাজ্যাভিষেক উপলক্ষ্যে যে উৎসবের ব্যবস্থা করা হচ্ছিল—তা বন্ধ হয়ে গেল। সারা অযোধ্যায় বিষাদের কালোছায়া নেমে এলো। রামচন্দ্র বনবাসে যাবার জন্যে তৈরী হতে লাগলেন। এমন সময় সীতা রামচন্দ্রের কাছে এসে জানালেন—তিনি কিছুতেই শ্রীরামচন্দ্রকে একা ছেড়ে দেবেন না—তিনিও তাঁর সঙ্গে যাবেন। রামচন্দ্র সীতাকে অনেক বোঝালেন, বনবাসের দুঃখ কষ্টের কথা জানালেন। কিন্তু সীতা কোন কথাই কানে তুললেন না। স্বামীর সঙ্গে বনবাসে যাওয়াই স্থির করলেন।

এদিকে লক্ষ্মণ সমস্ত কথা শুনে ততক্ষণে রাগে দিক্‌-বিদিক্‌ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়েছিলেন। তিনি রামের কাছে এসে বললেন—"সকলের মতের বিরুদ্ধে যদি তোমাকে সিংহাসনে বসানোর জন্যে যুদ্ধ করতে হয়, আমি তাও করতে প্রস্তুত।" রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে অনেক বুঝিয়ে-সুজিয়ে শান্ত করলেন। বললেন--"দেখ, আমি যদি পিতৃসত্য পালন না করি, তা হলে ভবিষ্যতে প্রজারাই বা আমার আদেশ পালন করবে কেন ?" লক্ষ্মণ বললেন—"বেশ, তাই যদি হয়, তাহলে এই রাজপ্রাসাদ ছেড়ে আমিও তোমার সঙ্গে বনে যাবো।" শেষ পর্যন্ত তাই স্থির হলো।

অযোধ্যার রাজপুরীতে অন্ধকার নেমে এলো। রামচন্দ্রের বনবাসের খবর পেয়ে

সকলেই কাঁদতে লাগলো। এদিকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা সন্ন্যাস বেশ ধারণ করে বনবাসে যাবার জন্যে প্রস্তুত হলেন। রাজা দশরথের মন্ত্রী সুমন্ত্র চোখের জল ফেলতে ফেলতে রাজপ্রাসাদের তোরণদ্বারে রথ নিয়ে এসে হাজির হলেন। রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা রাজপুরীর সমস্ত গুরুজনদের পায়ের ধূলো নিয়ে রথে গিয়ে উঠলেন, রথ ছেড়ে দিল।

দেখতে দেখতে সকলের চোখের সামনে দিয়ে রথ দ্রুতবেগে বেরিয়ে গেল। আত্মীয় পরিজনেরা জলভরা চোখে সেই দিকে চেয়ে রইলেন। রথ দৃষ্টির বাইরে চলে যেতেই সকলে ব্যাকুল ভাবে কেঁদে উঠলেন, আর রাজা দশরথ মূর্চ্ছিত হয়ে আবার মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। চারদিনের মধ্যে রাজার জ্ঞান আর ফিরল না, শেষে শোকে দুঃখে তিনি মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়লেন।

এদিকে রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা, নানা দেশ পেরিয়ে রথ চালিয়ে, শেষে তমসা নদীর তীরে উপস্থিত হলেন। রথ নিয়ে সুমন্ত্র ফিরে গেলেন। সেদিনের মত তাঁরা তমসা নদীর তীরেই রাত্তিরটুকু কাটালেন। পরের দিন সকালে আবার তাঁরা যাত্রা শুরু করলেন এবং ঘুরতে ঘুরতে ক্লান্ত হয়ে শেষে গুহক চণ্ডালের দেশে পৌঁছোলেন। এই গুহক ছিলেন রামচন্দ্রের বন্ধু। গুহক রামচন্দ্রের কাছে তাঁর বনবাসে আসার সমস্ত কারণ শুনে, তিনি রামচন্দ্রকে তাঁর রাজসিংহাসনে বসাতে চাইলেন। কিন্তু রামচন্দ্র সে অনুরোধ রাখলেন না। পিতৃসত্য পালনের উদ্দেশ্যেই যে তিনি বনে এসেছেন, সে কথা স্পষ্ট করেই গুহককে জানিয়ে দিলেন।

গুহক চণ্ডালের দেশ থেকে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা এবার চিত্রকূট পর্বতের দিকে যাত্রা করলেন।

অযোধ্যায় যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন ভরত সেখানে ছিলেন না, তিনি গিয়েছিলেন নন্দীগ্রামে তাঁর মামার বাড়ীতে। সেখান থেকে ফিরে এসে তিনি এই নিদারুণ সংবাদ শুনে খুবই দুঃখিত হলেন। কৈকেয়ীর বর চাওয়ার জন্যেই যে অযোধ্যার আনন্দের হাট এমন করে ভেঙ্গে গেল, তা তিনি বুঝতে পারলেন। আর এই নিদারুণ শোক সহ্য করতে না পেরেই যে দশরথ দেহত্যাগ করেছেন, সে কথাও তিনি শুনতে পেলেন। তাই

শত্রুঘ্নকে সঙ্গে নিয়ে ভরত, রাম, লক্ষ্মণ আর সীতাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে তখনই রথে চেপে যাত্রা করলেন। অনেক দূর আসার পর গুহক চণ্ডালের কাছে ভরত খবর পেলেন, রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে চিত্রকূট পর্বতের দিকে গেছেন। তাড়াতাড়ি রথ চালিয়ে ভরত চিত্রকূট পর্বতে এসে হাজির হলেন।

অযোধ্যায় ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্যে তিনি রামচন্দ্রের হাতে পায়ে ধরে অনুনয় বিনয় করতে লাগলেন ; কিন্তু রামচন্দ্র ফিরে যেতে রাজী হলেন না। ভরতকে অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে শান্ত করলেন। বললেন—পিতৃসত্য পালন করার জন্যেই তিনি বনে এসেছেন। যতদিন না চোদ্দবৎসর পূর্ণ হয়, ততদিন তিনি কিছুতেই আর অযোধ্যায় ফিরে যাবেন না। রামচন্দ্রকে প্রতিজ্ঞায় অটল দেখে, শেষে রামচন্দ্রের পায়ের খড়ম দুটো ভরত চেয়ে নিলেন। বললেন, —'যদি একান্তই ফিরে না যাও, তাহলে তোমার পায়ের খড়ম দুটি আমাকে দাও। তোমার এই খড়ম দুটি সিংহাসনের ওপর রেখে আমি রাজ্য পরিচালনা করব। কিন্তু অযোধ্যার সিংহাসনে আমি বসতে পারব না। আর এই চোদ্দ বৎসর পূর্ণ হলে তখনও যদি তুমি অযোধ্যায় ফিরে না যাও, তাহলে আমি আগুনে ঝাঁপ দিয়ে মরব। এরপর ভরত রামচন্দ্রের খড়ম দুটি মাথায় নিয়ে শত্রুঘ্নের সঙ্গে অযোধ্যায় ফিরে এলেন।
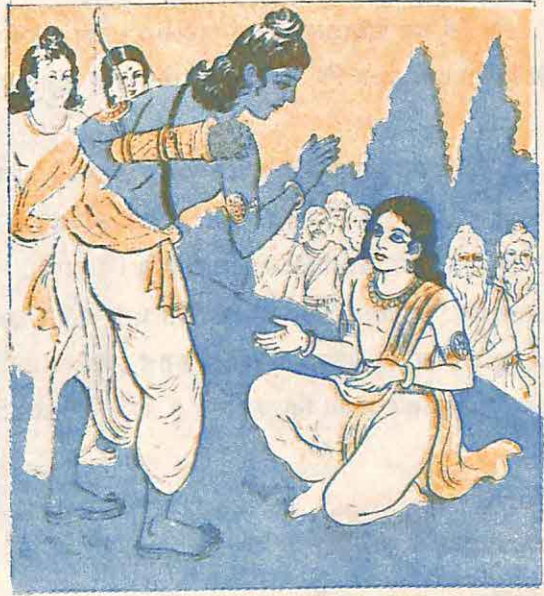
রামকে ফিরিয়ে নিয়ে যাবার জন্য ভরত অনুরোধ করতে লাগলেন

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। "—তা বটে, তবে ভরত তোমার পেটের ছেলে। রাম তো তা নয়—

একথা কে কাকে বলেছিল ? সে কি কুমন্ত্রণা দিয়ে কৈকেয়ীর মনটা ভেঙ্গে দিলে ? কৈকেয়ীকে সে কি করতে বলেছিল ? [৩ + ৩ + ৪]

২। মন্থরা রামকে বনে পাঠানোর উদ্দেশ্যে সম্পর্কে কৈকেয়ীকে কি বললে ? [৪]

৩। "দশরথের কথা শুনে কৈকেয়ী তখুনি বর দুটি চেয়ে বসলেন"—

কি কি বর চাইলেন ? কেন চাইলেন ? কার পরামর্শে চাইলেন ? দশরথ মূছিত হয়ে পড়লেন কেন ? রামচন্দ্র শুনে কি বললেন ? দশরথকে রামচন্দ্র কি বললেন ?

[১ + ২ + ২ + ২ + ২ + ১]

৪। "অযোধ্যার রাজপুরীতে অন্ধকার নেমে এলো।"

কেন অন্ধকার নেমে এলো ? সবাই কাঁদতে লাগলো কেন ? কে কে বনে গেলেন ? তোরণ দ্বারে কে রথ নিয়ে এসেছিলেন ? দশরথের কি হলো ? [২ + ২ + ২ + ২ + ২]

৫। "অযোধ্যায় যখন এই ঘটনা ঘটে, তখন ভরত সেখানে ছিলেন না।"

অযোধ্যায় কি ঘটনা ঘটলো ? ভরত কোথায় ছিলেন ? সেখানে কার বাড়ী ? দশরথের মৃত্যুর কারণ কি ? ভরত তখন কি করলেন ? রামচন্দ্র ভরতকে কি বলে বোঝালেন ?

[২ + ২ + ২ + ২ + ১ + ১]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "মেজরাণীর এক দাসী ছিল,"—

এই দাসীটির নাম কি ? তার চরিত্র কিরূপ ছিল ? সে দেখতে কেমন ছিল ? তাকে কুঁজী বলতো কেন ? [২ + ২ + ২ + ২]

২। "রামচন্দ্র রাজা হচ্ছে শুনে সে হিংসায় মরে যেতে লাগলো।"

কে হিংসায় মরে যেতে লাগলো ? কৈকেয়ী তাকে কি বললে ? হার পেয়ে মন্থরা কি খুশী হয়েছিল ? [২ + ৩ + ৩]

৩। "এ হার আমি পরতে পারবো না মেজরাণী মা।"

একথা কে কাকে বললে ? কেন বললে ? কি করলে সে হার পরতো ? তার উদ্দেশ্য কি ছিল ? [২ + ২ + ২ + ২]

৪। রাম, লক্ষ্মণ আর সীতা অযোধ্যা থেকে বিদায় নিয়ে কোথায় এলেন ? গুহক কে ? সে কি বললে ? রামচন্দ্র তাকে কি জানিয়ে দিলেন ? গুহকের দেশ থেকে রামচন্দ্র কোথায় গেলেন ? [২ + ১ + ২ + ১ + ২]

অরণ্যকাণ্ড

ভরত খড়ম দু'টি নিয়ে চলে যাবার পর রামচন্দ্র সীতা ও লক্ষ্মণকে নিয়ে দণ্ডকারণ্যের দিকে এগিয়ে চললেন। এই অরণ্যে ছিল অগস্ত্য মুনির আশ্রম। তাঁরা ঘুরতে ঘুরতে এই আশ্রমে এসে উপস্থিত হলেন। অগস্ত্য মুনি সব শুনে তাঁদের নিজের আশ্রমে থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। অগস্ত্য মুনির আশ্রমে রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা বেশ কয়েকদিন আনন্দেই কাটালেন। এর কিছুদিন পরে অগস্ত্য মুনির কাছ থেকে বিদায় নিয়ে দণ্ডকারণ্য ত্যাগ করে তাঁরা অন্য জায়গায় গিয়ে কুটীর নির্মাণ করে বসবাস করার ইচ্ছা করলেন।

অগস্ত্য মুনির আশ্রম ছেড়ে আসবার

সময় মুনি রামকে নানারকম অস্ত্র উপহার দিলেন। আর সেই সঙ্গে বললেন—'যদি তোমরা কুটীর নির্মাণ করেই বনে বাস করতে চাও, তাহলে পঞ্চবটী বনে যাও। এই পঞ্চবটী একটি অতি মনোরম জায়গা।'

মুনির কথামত রাম, লক্ষ্মণ ও সীতা পঞ্চবটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন। এই বনে জটায়ু পক্ষী বাস করতেন। জটায়ু পক্ষীর সঙ্গে রাজা দশরথের খুব বন্ধুত্ব ছিল। জটায়ু ছিলেন গরুড়ের ছোট ভাই অরুণের ছেলে। সোমপক্ষী নামে জটায়ুর আর এক বড় ভাই ছিল।

তোমরা অনেকেই হয়তো গরুড় পাখীর নাম শুনেছ। এই গরুড় ছিলেন নারায়ণের বাহন। জটায়ু রামের মুখে তাঁর বনবাসে আসার সকল কারণ জানতে পেরে বললেন—'তোমার পিতা রাজা দশরথ ছিলেন আমার বিশেষ বন্ধু। তোমরা এই পঞ্চবটী বনেই থাক। আমি আমার সাধ্যমত তোমাদের সাহায্য করব।'—এই পঞ্চবটী বনে একদিকে 'জনস্থান' নামে একটা বন ছিল। এই বনের মধ্যে অনেক রাক্ষস বাস করতো। পঞ্চবটীতে সুন্দর কুটীর নির্মাণ করে রাম, লক্ষ্মণ, সীতা পরমসুখেই বাস করছিলেন। এরই মধ্যে ঘটলো এক অঘটন।

লঙ্কার রাজা রাবণের বোন শূর্পনখা একদিন ঘুরতে ঘুরতে এসে হাজির হলো কুটীরের কাছে। সুন্দর চেহারা দেখে রামকে সে বলে বসলো—'তুমি আমাকে বিয়ে করবে?' হঠাৎ নির্লজ্জের মত শূর্পনখার এই প্রস্তাবে রাম একটু অবাক হয়ে গেলেন। তিনি শূর্পনখার কথার কোনও উত্তর তো দিলেনই না, উপরন্তু ঘৃণাভরে তাকে ফিরিয়ে দিলেন। কুটীরের অদূরে লক্ষ্মণ একাকী ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। শূর্পনখা তাঁর কাছে এসে আবার ঐ একই কথা বললে। লক্ষ্মণ অবজ্ঞাভরে শূর্পনখার কথা হেসে উড়িয়ে দিলেন। এই প্রত্যাখ্যান আর অবজ্ঞায় শূর্পনখা ক্ষেপে গেল। রাগে আর দুঃখে সে ভীষণ মূর্তি ধারণ করলো। তারপর বিরাট একটা হাঁ করে সীতাকে গিলে খেতে এলো। তখন নিরূপায় হয়ে লক্ষ্মণ রাক্ষসীর কবল থেকে সীতাকে বাঁচানোর জন্যে এক সুতীক্ষ্ণ বাণ নিক্ষেপ করলেন। সেই বাণের আঘাতে শূর্পনখার নাক ও কান কেটে গেল।

ঝর ঝর করে রক্ত গড়িয়ে পড়তে লাগলো। যন্ত্রণায় কাতর হয়ে শূর্পনখা সেখান থেকে পালিয়ে গেল।

শূর্পনখা 'জনস্থান' বনে ফিরে গিয়ে অন্যান্য রাক্ষসদের কাছে তার লাঞ্ছনার কথা জানালো। যেখানে খর আর দূষণ নামে শূর্পনখার দূর সম্পর্কের দুই ভাই বাস

লক্ষ্মণ রেগে তীর দিয়ে শূর্পনখার নাক ও কান কেটে দিলেন।

করতো। শূর্পনখার কাছে তার লাঞ্ছনার কাহিনী শুনে, খর আর দূষণ চোদ্দহাজার রাক্ষসকে অস্ত্র-শস্ত্রে সজ্জিত করে লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলো।

দেখতে দেখতে রাক্ষসেরা পঞ্চবটীর চারিদিক ঘিরে ফেললো। তারপর রাম লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে তারা আক্রমণ চালাতে লাগলো! এত বড় একটা আক্রমণের জন্যে

রাম-লক্ষ্মণ একেবারেই প্রস্তুত ছিলেন না। তবুও তাঁরা রাক্ষসদের প্রতিরোধ করতে প্রাণপণ চেষ্টা করতে লাগলেন। দেখতে দেখতে তুমুল যুদ্ধ বেধে গেল। রাম-লক্ষ্মণের হাতে খর ও দূষণ আর সেই চোদ্দ হাজার রাক্ষস প্রাণ হারালো। রাক্ষসদের সঙ্গে এই যুদ্ধে কোনরকমে অকম্পন নামে এক রাক্ষস বেঁচে গিয়েছিল। সে রাক্ষসদের রাজা রাবণের কাছে গিয়ে রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে নালিশ জানালো।

এদিকে নাক কান কাটা শূর্পনখাও কাঁদতে কাঁদতে লঙ্কায় গিয়ে হাজির হলো। ইনিয়ে বিনিয়ে মিথ্যে করে নানান কথা বলে রাবণকে উত্তেজিত করে তুললো।

রাবণ শূর্পনখার মুখে সব কথা শুনে, রাম-লক্ষ্মণকে শাস্তি দেবার জন্যে পঞ্চবটী বনে যাত্রা করার ব্যবস্থা করতে লাগলেন। এর মধ্যে অকম্পন এসে রাবণকে বললে— মহারাজ! রাম-লক্ষ্মণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ না করে বরং মারীচকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চবটী বনে যান! অকম্পনের পরামর্শ মত রাজা রাবণ মারীচকে সঙ্গে নিয়ে পঞ্চবটী অভিমুখে যাত্রা করলেন।

শূর্পনখা রাবণের কাছে উপস্থিত হলো।

এই মারীচ ছিল মায়াবী। সে ইচ্ছে করলে ননা রকম রূপ ধারণ করতে পারত। পঞ্চবটীতে এসে রাবণ মারীচকে সোনার হরিণের রূপ ধারণ করে কুটীরের চারপাশে ঘুরে বেড়াতে বললে। রাম যে কত শক্তিধর মারীচ তা জানতো। কিন্তু রাবণ রাজার ভয়ে সে বাধ্য হয়ে সোনার হরিণের রূপ ধারণ করলে।

সীতা তখন কুটিরের দাওয়ায় বসে রামচন্দ্রের সঙ্গে কথা বলছিলেন। সহসা দেখতে পেলেন, একটি সোনার হরিণ তাঁর কুটিরের সামনে নেচে নেচে খেলা করছে। সোনার হরিণটিকে দেখে সীতার ভারী লোভ হলো। ঐ সোনার হরিণটিকে ধরে দেবার জন্যে সীতা রামচন্দ্রকে অনুরোধ করলেন। রামচন্দ্র হরিণটিকে ধরার জন্যে এগিয়ে গেলেন। হরিণও যত ছোটে, রামচন্দ্রও হরিণটিকে ধরার জন্যে তত ছোটেন। এইভাবে রামচন্দ্র কুটির থেকে অনেক দূরে এগিয়ে গেলেন ; কিন্তু হরিণটিকে কিছুতেই ধরতে পারলেন না।

এইভাবে রামচন্দ্র যখন অনেকদূর গিয়ে পড়েছেন। এই সময় কে যেন কুটিরের কাছে অবিকল রামের গলায় বলে উঠলো—'আমি বড়ই বিপদে পড়েছি, লক্ষ্মণ তুমি শিগগির এসো।' এই কথা শুনে সীতা ভয়ে অস্থির হয়ে উঠলেন। লক্ষ্মণ কিন্তু মোটেই ভয় পেলেন না। তিনি বুঝলেন এ কোন রাক্ষসের ছলনা। তিনি নির্ভয়ে এসে কুটিরের দাওয়ায় বসলেন। সীতা কিন্তু স্থির হতে পারলেন না, তিনি রামের খোঁজে লক্ষ্মণকে কুটির ছেড়ে যাওয়ার জন্যে বারবার অনুরোধ করতে লাগলেন।

সীতার অনুরোধে শেষ পর্যন্ত লক্ষ্মণ অনিচ্ছা সত্বেও রামের খোঁজে বেরিয়ে পড়লেন। এদিকে রাবণ সন্ন্যাসীর বেশে কুটিরের পেছনে একটা নির্জন স্থানে সুযোগের অপেক্ষায় লুকিয়ে ছিলেন। এইবার সুযোগ বুঝে রাবণ সীতাকে জোর করে রথে তুলে নিয়ে তাড়াতাড়ি লঙ্কার দিকে রথ চালিয়ে দিলেন।

এর কিছুক্ষণ পরে রাম-লক্ষ্মণ কুটিরে ফিরে এসে দেখেন, সীতা নেই। ভয়ে ভাবনায় তাঁরা বনের চারিদিকে খোঁজাখুঁজি করতে লাগলেন ; কিন্তু কোথাও সীতাকে পাওয়া গেল না।

খুঁজতে খুঁজতে কিছুদূর আসতেই রাম-লক্ষ্মণ জটায়ুকে ক্ষত বিক্ষত অবস্থায় এক জায়গায় পড়ে থাকতে দেখলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁরা ছুটে জটায়ুর কাছে গেলেন। কোন রকমে জটায়ু তখনও প্রাণে বেঁচে ছিলেন। রাম-লক্ষ্মণ তাঁর কাছে জানতে পারলেন, রাজা রাবণ সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে। আর রাবণের হাত থেকে সীতাকে রক্ষা

করতে গিয়ে জটায়ুর এই অবস্থা। কোনও রকমে সীতাহরণের কাহিনী রাম-লক্ষ্মণকে বলে জটায়ু শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।
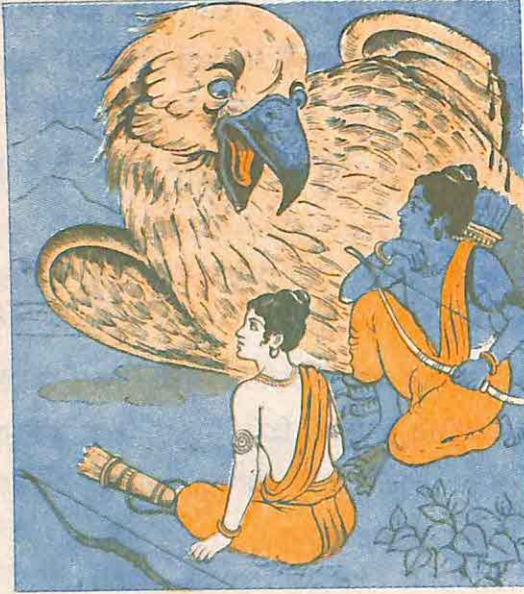
জটায়ু রাম-লক্ষ্মণকে সীতাহরণের কথা জানালেন

রাম-লক্ষ্মণ জটায়ুর সৎকার করে আবার চারিদিকে সীতার অনুসন্ধান করতে করতে গোদাবরী নদীর ধারে এলেন।

গোদাবরী নদীর ধারে এক রাক্ষস বাস করত। তার নাম ছিল 'কবন্ধ'। কবন্ধ মানে যার মাথা নেই। এই কবন্ধর মুখটা ছিল পেটের ওপর, আর ছিল একটা মাত্র চোখ। চোখটা সব সময় জ্বল জ্বল করে জ্বলতো; কিন্তু তার হাত দুটো ছিল খুব বড়। একটা হাত সে যদি বাড়াতো, তাহলে সে হাতটা চার ক্রোশ দূরে গিয়ে পড়তো। এই হাত নিয়েই সে দূরের জীব-জন্তু ধরে এনে খেতো। হঠাৎ রাম-লক্ষ্মণকে গোদাবরীর তীরে জঙ্গলের মধ্যে দেখে, তার ভারী লোভ হল। সে হাত বাড়িয়ে রাম-লক্ষ্মণকে ধরতে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাম তাঁকে লক্ষ্য করে বাণ ছুঁড়লেন; কিন্তু সে রামের বাণে মরলো না—বাণটা তার বুকে লাগতেই সে ফিরে পেলো সুন্দর এক চেহারা। কবন্ধের এই পরিবর্তন দেখে রাম-লক্ষ্মণ তো অবাক। রাম-লক্ষ্মণের কাছে এগিয়ে এসে কবন্ধ তার পূর্বজীবনের কাহিনী বলতে লাগলো।

রাক্ষস সেজে মুনিকে ভয় দেখানোর জন্যে দেবরাজ ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে গিয়ে, তাঁর বজ্রের আঘাতে পেটের মধ্যে তার মাথাটা ঢুকে গিয়েছিল। আজ রামের বাণের আঘাতে সে অভিশাপ মুক্ত হলো।

এর পর কবন্ধ রাম-লক্ষ্মণের বিপদের কথা শুনে বললো—'বানরদের রাজা সুগ্রীব এখন ঋষ্যমূক পর্বতে বাস করছেন। তাঁর দেশ থেকে তিনি এখন বিতাড়িত। সুগ্রীবের বড় ভাই বালী তাঁকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন। এখন আপনি যদি সুগ্রীবকে গিয়ে সাহায্য করেন, তাহলে সেও আপনার বিপদে আপনাকে সাহায্য করবেন।'

রাম-লক্ষ্মণ কবন্ধের যুক্তি-পরামর্শ মত পম্পা নদী পার হয়ে, ঋষ্যমূক পর্বতের দিকে এগিয়ে চললেন।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। "মুনির কথামত রাম-লক্ষ্মণ ও সীতা পঞ্চবটীর উদ্দেশ্যে যাত্রা করলেন"—

কোন মুনির কথায় তাঁরা পঞ্চবটী বনে যাত্রা করেন? মুনি পঞ্চবটিতে যেতে বললেন কেন? অগস্ত্য মুনির আশ্রম কোথায় ছিল? রামচন্দ্র অগস্ত্য মুনির নিকট কি ইচ্ছা প্রকাশ করেন? [২+৩+৩+২]

২। "লঙ্কার রাজা রাবণের······কুটিরের কাছে।"

শূর্পনখা এসে কাকে কি বলেছিল? রাম অবাক হয়ে গেলেন কেন? শূর্পনখার কথায় রামচন্দ্র কি করলেন? লক্ষ্মণ শূর্পনখার কথায় কি বললেন? ফলে কি হলো? [২+২+২+২+২]

৩। "বিরাট একটা হাঁ করে সীতাকে গিলে খেতে এলো।"

কে সীতাকে গিলে খেতে এলো? লক্ষ্মণ কেন বাণ নিক্ষেপ করলেন? সেই বাণের আঘাতে কি হলো? [৩+৩+৪]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "এই বনে জটায়ু পক্ষী······জটায়ুর বড় ভাই ছিল।"

জটায়ু কোন্ বনে থাকত? দশরথের সঙ্গে তাঁর কি সম্বন্ধ ছিল? অরুণ কে? জটায়ুর বাবার নাম কি? তার বড় ভাইয়ের নাম কি? [২+১+১+২+২]

২। "তোমরা অনেকেই গরুড়······ঘটলো এক অঘটন।"

গরুড় কে ছিলেন? রাক্ষসরা কোন বনে থাকত? রামচন্দ্র কোথায় কুটির নির্মাণ করলেন? সেখানে তাঁরা কিভাবে বাস করছিলেন? [২+২+২+২]

৩। "শূর্পণখা জনস্থান······যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলো।"

খর আর দূষণ কে? জনস্থানে কত রাক্ষস বাস করতো? লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে কারা গিয়েছিল? তাদের সঙ্গে কত রাক্ষস ছিল? [২+২+২+২]

কিষ্কিন্ধ্যা কাণ্ড

নদ-নদী, বন-জঙ্গল, পাহাড়-পর্বত পেরিয়ে রাম-লক্ষ্মণ কবন্ধের কথামত ঋষ্যমূক পর্বতে এসে পৌঁছোলেন। বালী তার ছোট ভাই সুগ্রীবকে দেশ থেকে তাড়িয়ে দিতে, সুগ্রীব মনের দুঃখে এইখানে এসে লুকিয়ে ছিলেন। সুগ্রীবের এমন কোন অপরাধ ছিল না, যার জন্যে তার এই শাস্তি। ভুল বোঝাবুঝির জন্যেই সুগ্রীবকে শাস্তি ভোগ করতে হয়েছিল। এখন সেই কাহিনী তোমাদের বলছি—

এক সময় এক দানবের সঙ্গে বালীর যুদ্ধ হয়। বালীর ছিল অপরিসীম শক্তি। বালীর এই শক্তির পরিচয় পেয়ে, দানব ভয়ে ভয়ে পর্বতের এক গুহার মধ্যে

লুকিয়ে পড়ে। বালীও ছাড়বার পাত্র নয়। সেও দানবকে গুহার মধ্যে তাড়া করে যায়। গুহার মধ্যে ঢোকার আগে বালী সুগ্রীবকে বলে যায় গুহার মুখে পাহারা দেবার জন্যে। বালীর আদেশমত সুগ্রীব গুহার মুখে পাহারা দিতে থাকে। দিন যায়, মাস যায়, বছর ঘুরলো—তবুও বালীর দেখা নেই। কিছুদিন পরে হঠাৎ গুহার মধ্যে থেকে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগলো। রক্ত দেখে সুগ্রীব মনে করলেন, বালী বেঁচে নেই—নিশ্চয়ই তিনি দানবের হাতে মারা গেছেন। সুগ্রীব তখন চিন্তা করে গুহার মুখে বিরাট একটা পাথর চাপা দিয়ে রাজধানী কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এলেন।

সুগ্রীবের কাছে সব শুনে, কিষ্কিন্ধ্যার প্রজাদের ধারণা হলো, তাদের রাজা বালী নিশ্চয়ই বেঁচে নেই, তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এ রকম অবস্থায় সিংহাসন তো খালি থাকতে পারে না। তাই সকলে পরামর্শ করে, সুগ্রীবকে কিষ্কিন্ধ্যার রাজ-সিংহাসনে বসালেন। সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হয়ে নিশ্চিন্ত মনে রাজকার্য পরিচালনা করতে লাগলেন। এর মধ্যে হঠাৎ একদিন বালী কিষ্কিন্ধ্যায় এসে হাজির হলেন। বড় ভাই ফিরে আসায় সুগ্রীব সঙ্গে সঙ্গে সিংহাসন ত্যাগ করলেন। বালী আবার কিষ্কিন্ধ্যার রাজা হয়ে সিংহাসনে বসলেন। কিন্তু বালীর ধারণা হলো, সুগ্রীব মতলব করেই তার মৃত্যু-সংবাদ রটিয়ে কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসন দখল করে বসেছিল। সুগ্রীব অনেক করে বালীকে বোঝাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু বালীর এই ভুল ধারণা কিছুতেই শোধরাতে পারলেন না। বালী সুগ্রীবকে শেষ পর্যন্ত দেশ থেকে তাড়িয়ে দিলেন। দুঃখে, কষ্টে, অভিমানে সুগ্রীব ঋষ্যমূক পর্বতের গভীর অরণ্যে এসে, লুকিয়ে বাস করতে লাগলেন। কিন্তু সব সময়ের জন্যেই সুগ্রীবের মনের ভেতর একটা ভয় লেগেই থাকে, বালীর অনুচরেরা তার সন্ধান পেলে তাকে যদি মেরে ফেলে, এই ভয় নিয়েই সুগ্রীব দিন কাটাতে লাগলেন।

এরই মাঝে একদিন রাম-লক্ষ্মণ ঋষ্যমূক পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন। রাম-লক্ষ্মণকে দেখে সুগ্রীব ভাবলেন, নিশ্চয়ই বালীর অনুচরেরা তাকে হত্যা করতে এসেছে। সুগ্রীব হনুমানকে ডেকে, এই অচেনা মানুষদের

খোঁজ-খবর নেবার জন্যে পাঠালো। হনুমানের ছিল অসীম ক্ষমতা। তারপর আবার দেবতাদের বরে সে ইচ্ছে করলে নিজের রূপ বদলাতে পারত। হনুমান সুগ্রীবের কথায় রাম-লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে জানতে চাইলো, এই পর্বতে তাদের আসার কারণ কি? রাম জানালেন—তাঁরা সুগ্রীবের সঙ্গে দেখা করতে এসেছেন। কবন্ধের কাছে তারা সুগ্রীবের পরিচয় জানতে পেরেছেন। রামচন্দ্রের কথায় হনুমান খুশী হলো। আর সেই সঙ্গে তাঁদের কাছে নিজের পরিচয় দিলো।

এরপর হনুমান রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে সুগ্রীবের কাছে এলো। রাম-লক্ষ্মণের পরিচয় পেয়ে সুগ্রীবের আর আনন্দ ধরে না। সীতার খোঁজেই যে তাঁরা ঋষ্যমূক পর্বতে এসেছেন, এ কথা শোনা মাত্রই সুগ্রীব কিছু গহনা আর একটা চাদর বার করে রামচন্দ্রকে দেখালো। গহনা আর চাদর দেখে রামচন্দ্র বুঝতে পারলেন যে এ গহনা আর চাদর সীতার। স্মৃতিচিহ্ন দেখে রাম-লক্ষ্মণ কাঁদতে লাগলেন। সুগ্রীব বললেন—'এক রাক্ষস এই ক'দিন আগে এক রমণীকে হরণ করে নিয়ে গেছে। আমাকে দেখে সেই রমণী আকাশপথ থেকে এগুলো ফেলে দিয়েছিলেন, আমি যত্ন করে এগুলো আমার কাছে রেখে দিয়েছি। সুগ্রীবের কথায় রাম-লক্ষ্মণ খুবই ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। তাঁরা সীতাকে উদ্ধার করার কথা ভাবতে লাগলেন।
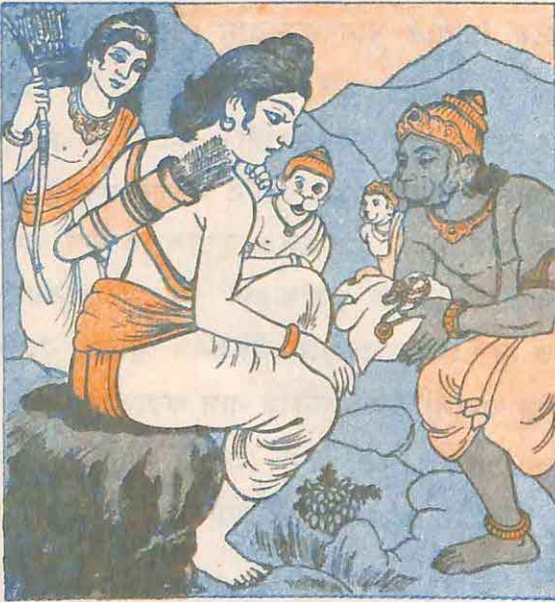
সুগ্রীব কিছু গহনা আর একটি চাদর
রামচন্দ্রকে দেখালেন

সুগ্রীব তখন রাম-লক্ষ্মণকে আশ্বস্ত করে বললে,—'আপনারা ভাববেন না। আমার প্রাণ দিয়েও আমি সীতাকে উদ্ধার করবো।' এরপর

রামচন্দ্র সুগ্রীবের কাছে তার আত্মগোপন করে থাকার কাহিনী শুনলেন। রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে পরম বন্ধু বলে গ্রহণ করলেন, আর সেই সঙ্গে জানালেন কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে সুগ্রীবকে বসানোর জন্যে তিনি তাঁর সমস্ত শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবেন।

এরপর সুগ্রীব রাম-লক্ষ্মণকে সঙ্গে নিয়ে কিষ্কিন্ধ্যায় এসে হাজির হলো। সুগ্রীবের ফিরে আসার খবর বালীর কানে গিয়ে পৌঁছালো। বালী তো রেগে আগুন, সুগ্রীবের এতবড় আস্পর্দ্ধা! যাকে তিনি রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন, দল-বল নিয়ে সে আবার ফিরে এলো!

এদিকে রাম-লক্ষ্মণের সাহায্য পেয়ে সুগ্রীব কিষ্কিন্ধ্যায় গিয়ে তোলপাড় শুরু করে দিল। সুগ্রীবের কাণ্ড-কারখানা দেখে বালী আর চুপ করে থাকতে পারলেন না। তিনি সুগ্রীবকে আক্রমণ করতে এগিয়ে এলেন। বালী আর সুগ্রীব দুই ভাইয়ের মধ্যে তখন ভীষণ মল্লযুদ্ধ শুরু হয়ে গেল। এই মল্লযুদ্ধে সুগ্রীব বালীর কাছে প্রায় হেরে যায় আর কি। এমন সময় রাম সুগ্রীবের অবস্থা বুঝতে পেরে, বালীকে লক্ষ্য করে এক বাণ ছুঁড়লেন। রামের বাণে বিদ্ধ হয়ে বালী কাবু হয়ে পড়লো। সে রামকে লক্ষ্য করে বলতে লাগলো—'তুমি আমাকে বাণবিদ্ধ করে খুব অন্যায় করেছ। আমাদের ভায়ে ভায়ে ঝগড়া, এর সঙ্গে তোমার কোনও সম্বন্ধ নেই। আমাকে বাণ মারা তোমার উচিত হয় নি।' বালীর কথার উত্তরে রাম

বালী আর সুগ্রীবের ভীষণ মল্লযুদ্ধ বেধে গেল

বললেন—'তুমি মহাপাপী। সুগ্রীবকে অন্যায়ভাবে তোমার রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দিয়েছ। সেই অন্যায়ের প্রতিবাদ করে আমি তোমায় বাণবিদ্ধ করেছি।'

বালী যখন মৃত্যু-যন্ত্রণায় কাতর, সেই সময় রামচন্দ্র বালীকে আশ্বস্ত করে বললেন— এরপর কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে সুগ্রীব রাজা হয়ে বসলেও, তোমার পুত্র অঙ্গদকে সে যুবরাজের পদে অভিষিক্ত করবে।' রামচন্দ্রের মুখে এই কথা শোনার পর বালী দেহত্যাগ করলো। বালীর স্ত্রী তারা আর তার ছেলে অঙ্গদ কাঁদতে লাগলো।

কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে সুগ্রীব রাজা হয়ে বসার পর, সে তার প্রতিশ্রুতি মত চারিদিকে সীতার খোঁজ-খবর করতে আরম্ভ করলো। সুগ্রীবের আদেশে বানরেরা সীতার খোঁজে দিকে দিকে ঘুরে বেড়াতে লাগলো। বানরদের ভেতরে সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ হলো বীর হনুমান। রামচন্দ্র তাকে ডেকে নিজের হাত থেকে একটি আংটি খুলে দিয়ে বললেন—'যদি তুমি সীতার কোনও খোঁজ পাও, তাহলে তাকে আমার এই আংটিটি দিও। সীতা এই আংটিটি দেখলেই বুঝতে পারবে, তুমি আমাদের পরমাত্মীয়, আপনার লোক।'

এরপর যুবরাজ অঙ্গদ আর জাম্বুবানকে নিয়ে হনুমান সীতার খোঁজে দক্ষিণাপথে যাত্রা করলো। এছাড়া অন্যান্য বানরেরা নানা দলে বিভক্ত হয়ে চারিদিকে সীতার খোঁজে বার হয়ে গেল। কিন্তু তারা সীতার কোনও খোঁজ না পেয়ে, কিছুদিনের মধ্যেই কিষ্কিন্ধ্যায় ফিরে এলো। শুধু দক্ষিণাপথে যারা সীতার খোঁজে বেরিয়েছিল, সেই হনুমান, জাম্বুবান, অঙ্গদ আর তাদের দলবল ফিরে এলো না।

এদিকে হনুমান, জাম্বুবান আর অঙ্গদ সন্ধান করতে করতে অবশেষে তারা সমুদ্রের তীরে এসে বসলো। সকলেই ভাবতে লাগলো—রামচন্দ্রের কাছে গিয়ে তারা কি বলবে? কি বলে মুখ দেখাবে? এই রকম সাত পাঁচ যখন তারা ভাবছে, ঠিক সেই সময় জটায়ুর বড় ভাই সম্পাতির সঙ্গে তাদের দেখা হয়ে গেল। সম্পাতি হনুমানকে জানালো, কিছুদিন আগে এই পথে লঙ্কার রাজা রাবণ একটি স্ত্রীলোককে হরণ করে নিয়ে গেছে। তোমরা এই যে বিশাল সমুদ্র দেখছ, এই সমুদ্রের ওপারে একটা দ্বীপ আছে, তার নাম

লঙ্কা। সেই লঙ্কা দ্বীপের রাজা রাবণই সীতাকে হরণ করে নিয়ে গেছে।

সকলে সম্পাতির কাছে সীতার খবর পেলেও, কি করে বিশাল সমুদ্র তারা পার হবে, সেই কথাই সকলে ভাবতে লাগলো। একশো যোজনেরও বেশী চওড়া এই সমুদ্র পার হওয়া কি সোজা কথা! তারা যখন সমুদ্র পার হওয়ার কথা ভাবছে, তখন জাম্বুবান হনুমানকে বললে—দেখ, আমাদের মধ্যে তুমিই সবচেয়ে শক্তিধর। তাছাড়া ইচ্ছামত তুমি যখন তখন তোমার দেহের রূপ বদলাতে পার। একমাত্র তুমিই সমুদ্র পার হতে পারবে।

জাম্বুবানের কথায় হনুমান উৎসাহিত হলো, তারপর সে এক লাফে মহেন্দ্র পর্বতে গিয়ে উঠলো। মহেন্দ্র পর্বতের চূড়াটি ছিল বিরাট উঁচু। সেই চূড়ায় উঠে হনুমান একমনে 'রামনাম' জপ করতে লাগলো। তারপর সেখান থেকে সমুদ্র পেরিয়ে যাবার জন্যে এক লাফ দিলো।

হনুমান লাফ দিয়ে সমুদ্রের মাঝামাঝি যখন এসেছে, ঠিক সেই সময়ে সুরসা আর সিংহিকা নামে দুই রাক্ষসী প্রকাণ্ড হাঁ করে হনুমানের পথ আটকাবার চেষ্টা করলো। হনুমান সঙ্গে সঙ্গে নিজের দেহটাকে খুব ছোট করে নিয়ে সিংহিকার পেটের মধ্যে ঢুকে গেল, আর খানিক পরেই তার পেট চিরে বেরিয়ে গেল। সিংহিকা রাক্ষসী মরে গেল। হনুমান তখন নির্বিঘ্নে বিশাল সমুদ্র পেরিয়ে লঙ্কায় গিয়ে উপস্থিত হয়েছে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। "এক সময়……বালীর কথা জানালেন।"

বালী কে? দানবের সঙ্গে বালীর যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছিল? সুগ্রীবকে বালী কি আদেশ করেছিল? বালী বেঁচে নেই একথা সুগ্রীবের মনে হলো কেন? সুগ্রীব তখন কি করেছিল? সে কোথায় ফিরে এলো?

[২ + ২ + ২ + ২ + ২]

২। "সুগ্রীবের কাছে……দিন কাটাতে লাগলেন।"

কিষ্কিন্ধ্যার লোকেদের কি ধারণা হলো? কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে কে বসলেন? সুগ্রীব সিংহাসন ত্যাগ করলেন কেন? বালীর কি ধারণা হয়েছিল? শেষ পর্যন্ত সুগ্রীবের কি হলো?

[২ + ২ + ২ + ২ + ২]

৩। "এরই মাঝে……পরিচয় দিলেন।"

রাম-লক্ষ্মণকে দেখে সুগ্রীবের ভয় পাবার কারণ কি? তিনি খোঁজ-খবর নেবার জন্যে কাকে পাঠালেন? ইচ্ছামত নিজের রূপ কে বদলাতে পারতো? সুগ্রীবের পরিচয় রাম-লক্ষ্মণকে কে দিয়েছিল?

[২ + ২ + ২ + ২ + ২]

৪। "এরপর হনুমান……ভাবতে লাগলেন।"

রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে হনুমান কোথায় এলেন? সুগ্রীবের আনন্দিত হওয়ার কারণ কি? সুগ্রীব রামচন্দ্রকে কি দেখালেন? রাম-লক্ষ্মণ কাঁদতে লাগলেন কেন? সুগ্রীব কি সংবাদ রাম-লক্ষ্মণকে দিলেন?

[২ + ২ + ২ + ২ + ২]

৫। "এরই মাঝে……শক্তি দিয়ে চেষ্টা করবেন।"

কে রাম-লক্ষ্মণকে আশ্বস্ত করলেন ? তিনি কি বললেন ? রাম-লক্ষ্মণ সুগ্রীবকে কিভাবে গ্রহণ করলেন ? তিনি সুগ্রীবকে কি বললেন ? আত্মগোপন করে থাকার কাহিনী কাকে সুগ্রীব বলেছিলেন ?

[২+২+২+২+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "এরপর সুগ্রীব……আবার ফিরে এলো।"

রাম-লক্ষ্মণকে নিয়ে সুগ্রীব কোথায় এলেন ? কিষ্কিন্ধ্যার রাজা তখন কে ছিলেন ? তিনি কি করলেন ? কিষ্কিন্ধ্যা থেকে কে কাকে তাড়িয়েছিল ? [২+২+২+২]

২। "এদিকে রাম-লক্ষ্মণের……বাণবিদ্ধ করেছি।"

কিষ্কিন্ধ্যায় এসে কার সাহায্যে সুগ্রীব কি করেছিল ? বালী চুপ করে থাকতে পারলেন না কেন ? মল্লযুদ্ধ শুরু হলো কাদের ? কে বাণবিদ্ধ হলো ? [২+২+২+২]

৩। "বালী যখন……কাঁদতে লাগলেন।"

মৃত্যু যন্ত্রণায় কে কাতর হয়েছিল ? রামচন্দ্র বালীকে কি বললেন ? বাণবিদ্ধ হয়ে বালীর কি হলো ? তারা আর অঙ্গদ কে ? [২+২+২+২]

৪। "কিষ্কিন্ধ্যার সিংহাসনে……আপনার লোক।"

বানরেরা কার খোঁজে ঘুরে বেড়াতে লাগলো ? এদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ কে ? রামচন্দ্র তার হাতে কি দিলেন ? কেন দিলেন ? [২+২+২+২]

৫। দক্ষিণাপথে সীতার খোঁজে কে কে বেরিয়েছিল ? অন্যান্য বানরেরা কি করছিল ? অঙ্গদ কোন্ রাজ্যের যুবরাজ ? সবাই ফিরে এলো আর কে কে ফিরল না ? [২+২+২+২]

৬। হনুমান, জাম্বুবান ও অঙ্গদ শেষে কোথায় এলো ? সেখানে তাদের কার সঙ্গে দেখা হলো ? তার পরিচয় কি ? রাবণ কোথাকার রাজা ছিলেন ? এই দেশটি কোথায় ? [২+২+২+২]

৭। হনুমান লাফ দিয়ে প্রথমে কোথায় গেলেন ? সেখানে গিয়ে হনুমান্ কি করতে লাগলেন ? সমুদ্র পার হবার সময় কে কে হনুমানকে বাধা দিয়েছিল ? হনুমান কি করেছিল ?

[২+২+২+২]
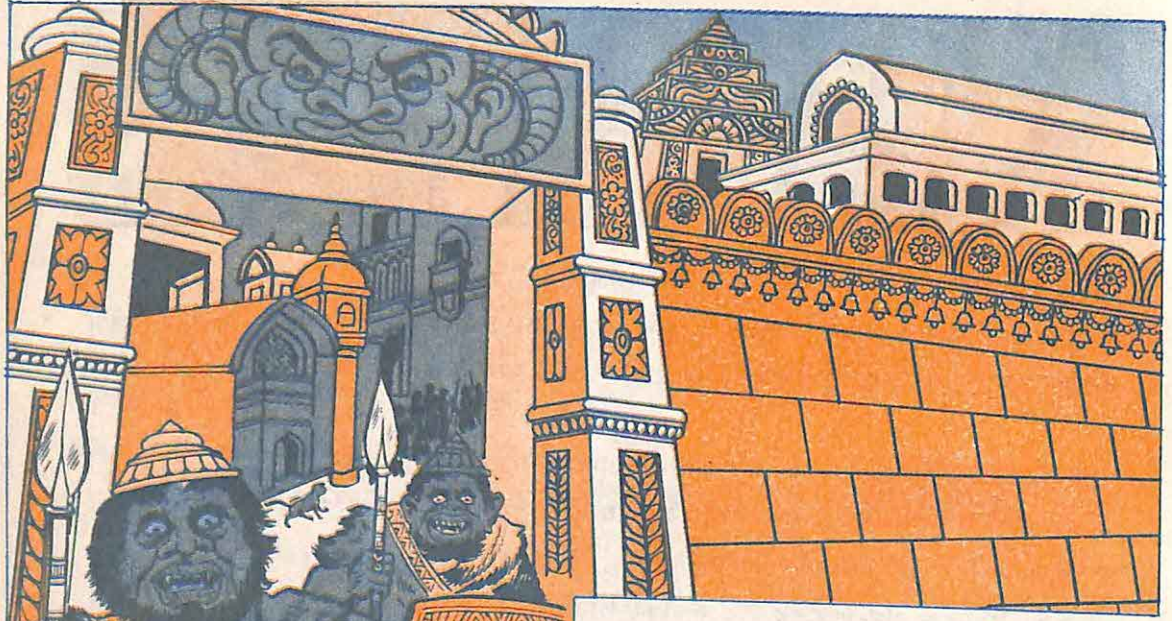
সুন্দরা কাণ্ড

অনেক চেষ্টা ও কষ্ট করে হনুমান তো লঙ্কায় এসে পৌঁছালো। কিন্তু তখন সন্ধ্যা হয়ে গেছে। সারা লঙ্কাপুরী অন্ধকারে ঢেকে গেছে। হনুমান ভাবতে লাগলো, এই অন্ধকারের মাঝে কি করে সে সীতার খোঁজ করবে? অনেক ভেবেচিন্তে হনুমান তার বিরাট দেহটাকে মর্কটের মত ছোট্ট করে ফেললে। তারপর সেই ছোট্ট দেহটাকে নিয়ে সে চারিদিকে সীতাকে খুঁজতে লাগলো।

খুঁজতে খুঁজতে সকলের চোখ এড়িয়ে কোনও রকমে রাবণ রাজার বাড়ীতে ঢুকে পড়লো। বাড়ীতে ঢুকে সে অবাক হয়ে গেল! হাতীশালে হাতী, ঘোড়াশালে ঘোড়া, রাজসভায় সোনার সিংহাসন, কারুকার্য করা বড় বড় স্ফটিকের থাম, সারা রাজবাড়ী

আলোয় আলোকিত। চারিদিকে যেন মণিমুক্তার ছড়াছড়ি ; ঘরে ঘরে সোনার খাট—সোনার পালঙ্ক। সব দেখে শুনে হনুমান তো অবাক হয়ে গেল ! কিন্তু এই বিশাল রাজপুরীর মধ্যে তন্নতন্ন করে খুঁজেও সে সীতার খোঁজ পেলো না। সেখান থেকে হনুমান নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।

রাজপ্রাসাদের কিছুদূরে রাবণ রাজার এক সুসজ্জিত বাগান ছিল। এই বাগানের নাম ছিল 'অশোক কানন'। হনুমান এই অশোক কাননে এসে দেখলে, কিছুদূরে কতকগুলো রাক্ষসী এক পরমাসুন্দরী রমণীকে ঘিরে বসে আছে। রাক্ষসীদের যেমন কুৎসিত চেহারা, গলার স্বরও তেমনি কর্কশ। হনুমান আন্দাজে বুঝে নিলো, যে সুন্দরী রমণীটিকে রাক্ষসীরা ঘিরে বসে আছে, তিনিই সীতা।

সব দেখে শুনে হনুমান একটা গাছের উপর সুযোগের অপেক্ষায় চুপচাপ বসে রইলে।

এইভাবে কিছুক্ষণ বসে থাকতে থাকতে হনুমান দেখতে পেলো, সীতাকে এতক্ষণ যারা পাহারা দিচ্ছিল, তারা ঘুমিয়ে পড়েছে। হনুমান তখন আস্তে আস্তে গাছ থেকে নেমে সীতাকে গিয়ে প্রণাম করলো। তারপর নিজের পরিচয় দিয়ে রামচন্দ্রের দেওয়া আংটীটি বার করে সীতাকে দেখালো। রামচন্দ্রের আংটীটি দেখে সীতা কাঁদতে লাগলেন। হনুমান তাঁকে বললে—'আপনি কিছু ভাববেন না মা ! যে কোনও উপায়ে আমরা আপনাকে উদ্ধার করবোই।' কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীব রামচন্দ্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, আপনাকে উদ্ধার করার জন্যে তাঁর সমস্ত সৈন্য-সামন্ত নিয়ে এই লঙ্কাপুরী আক্রমণ করবেন।
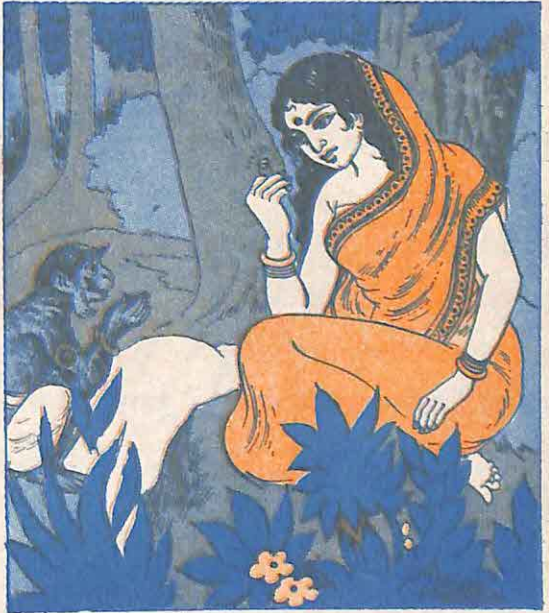
হনুমানের কাছে সব কথা শুনে সীতা তাঁর মাথা থেকে একটি মণি খুলে হনুমানকে দিয়ে বললেন—'রামচন্দ্রকে তুমি এই মণিটি দিও। তোমার সঙ্গে যে আমার দেখা হয়েছে এটি দিলেই তিনি বুঝতে পারবেন।'

এরপর সীতা হনুমানকে 'অজেয় হও' বলে আশীর্বাদ করলেন—আর সেই সঙ্গে তাকে সন্তান বলে স্বীকার করে নিলেন।

অনেক কষ্টে সীতার সন্ধান পাবার পর, হনুমানের আনন্দ দেখে কে? মহা আনন্দে সে তখন লম্ফ-ঝম্ফ শুরু করে দিল। অশোক কাননের গাছের ডালে ডালে সে তখন লাফালাফি দাপাদাপি করে বেড়াতে লাগলো। গাছের ফুল-ফল, ডাল-পালা ভেঙ্গে সাজানো বাগানের শোভা একেবারে নষ্ট করে দিল। হনুমানের এই অত্যাচারে যাদের ওপর বাগান দেখাশোনার ভার ছিল—তারা ছুটে এলো। বাধা দেবার চেষ্টা করলো হনুমানকে। শেষ পর্যন্ত তাদের অনেককেই হনুমানের হাতে প্রাণ হারাতে হলো। হনুমানের ভয়ে যারা পালিয়ে গিয়েছিল, তারা রাজা রাবণকে গিয়ে হনুমানের উৎপাতের কথা জানালো।

হনুমানের অত্যাচারের খবর পেয়ে রাবণ সৈন্য-সামন্তের সঙ্গে তাঁর পুত্র অক্ষকে পাঠালেন। অক্ষ এসে হনুমানের কাণ্ড-কারখানা দেখে, তাকে বন্দী করার চেষ্টা করলো; কিন্তু বন্দী হওয়া তো দূরের কথা—হনুমান অক্ষের আট আটটি ঘোড়াকে মেরে ফেললো। আর অক্ষের পা দু'টো ধরে শূন্যে বন্‌বন্‌ করে ঘোরাতে লাগলো, তারপর মাটিতে তাকে এমন আছাড় মারলো যে, অক্ষ প্রায় মর মর হয়ে গেল। সে কোনও রকমে প্রাণ বাঁচিয়ে রাজা রাবণকে গিয়ে খবর দিল। অক্ষের মুখে হনুমানের শক্তির কথা শুনে, রাবণ তার আর এক পুত্র ইন্দ্রজিৎকে ডেকে বললেন—'একটা হনুমান অশোক কাননে ঢুকে অত্যাচার করছে, তাকে উচিত মত শিক্ষা দিয়ে এসো।'

ইন্দ্রজিৎ যেমন বীর, তেমনি যোদ্ধা ছিলেন। মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতে পারতো বলে ইন্দ্রজিতের আর একটি নাম ছিল 'মেঘনাদ'। রাবণের আদেশে ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে জব্দ করার জন্যে সসৈন্যে অশোক কাননে গেলেন।

হনুমানের সঙ্গে ইন্দ্রজিতের যুদ্ধ বেধে গেল। সামনা-সামনি যুদ্ধে ইন্দ্রজিৎ

হনুমানকে লক্ষ্য করে বার বার বাণ ছুঁড়তে লাগলেন। কিন্তু হনুমানের ছিল অসীম ক্ষমতা। সে নানা কৌশলে বাণের আঘাত থেকে নিজেকে রক্ষা করতে লাগলো। ইন্দ্রজিৎ তখন নিরুপায় হয়ে নাগপাশ নামে এক অস্ত্র দ্বারা হনুমানকে বেঁধে ফেললো। ইন্দ্রজিৎ হনুমানকে বেঁধে ফেলেছেন দেখে, রাক্ষসেরা আনন্দে নৃত্য করতে লাগলো। যে যেখান থেকে পারলো আরও দড়ি-দড়া এনে হনুমানকে শক্ত করে বেঁধে ফেললো।
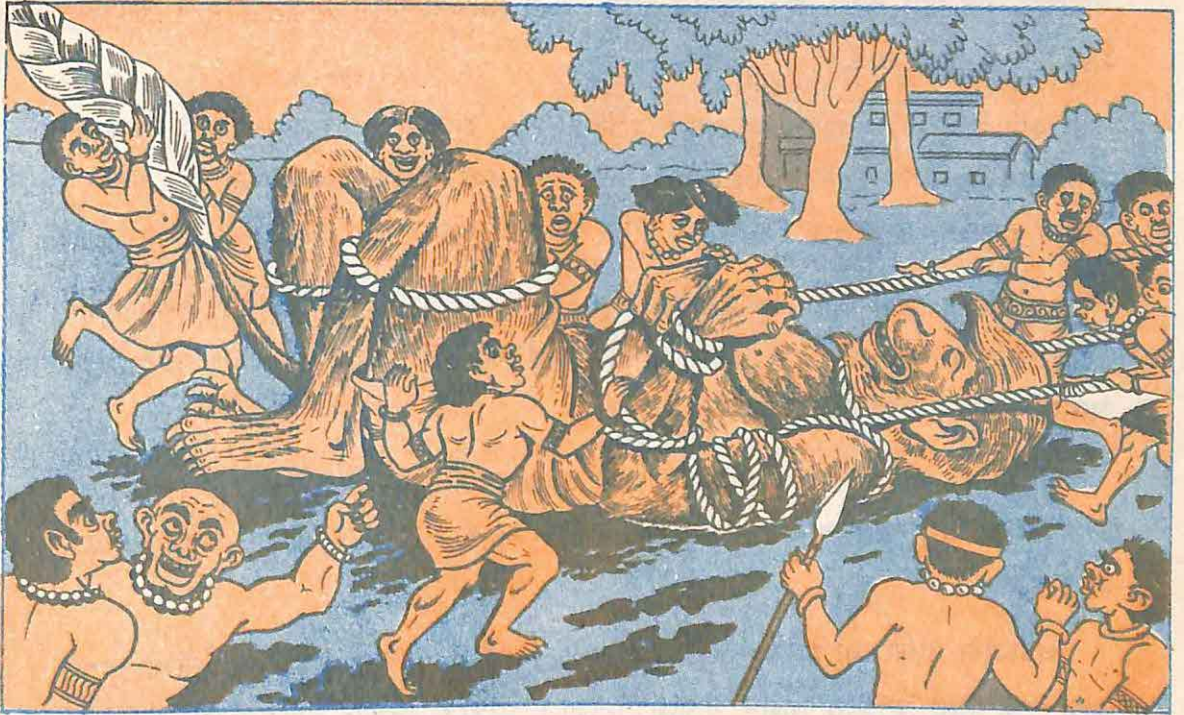
নাগপাশে বাঁধা পড়ার পর, আর কোনও বাঁধন দেওয়া নিষেধ ছিল। কিন্তু রাক্ষসেরা সে নিষেধ না মেনে, দড়ি-দড়া এনে নতুন করে বাঁধন দেওয়ার ফলে, নাগ-পাশের বাঁধন আপনিই খুলে গেল। বুদ্ধিতে হনুমান ছিল অদ্বিতীয়। নাগপাশের বাঁধন খুলে গেলেও সে কিন্তু পালাবার চেষ্টা করলো না, মরার মতন পড়ে রইলো।

রাবণের মন্ত্রী প্রহস্ত ছিল খুব চতুর লোক। সে বুঝতে পেরেছিল হনুমান মরেনি।

মরার ভান করে পড়ে আছে। সে তখন হনুমানকে টানতে টানতে রাবণ রাজার কাছে নিয়ে গেল। রাবণ প্রহস্তকে আদেশ করলেন, 'হনুমানকে জিজ্ঞাসা কর—কেন সে শুধু শুধু অশোক কাননের গাছপালা এইভাবে ভেঙ্গেছে ?'

প্রহস্ত প্রশ্ন করলে কি হয় ? হনুমান কিন্তু প্রহস্তের প্রশ্নের জবাব তাকে না দিয়ে, সোজা রাবণকেই দিলে। বললে—'তুমি লঙ্কার রাজা হয়ে বিনা দোষে কেন শুধু শুধু পরস্ত্রীকে এইভাবে হরণ করে আনলে ? যদি তুমি তোমার মঙ্গল চাও, তাহলে রামের ঘরণীকে ফিরিয়ে দাও।'

ছোট মুখে বড় কথা শুনে রাবণ আরও চটে গেলেন। বললেন--'আমি লঙ্কার অধীশ্বর। আমার মুখের ওপর এত বড় কথা বলতে কেউ সাহস করে না। কোন্ সাহসে তুমি একথা বললে ? কে তুমি ? কি তোমার পরিচয় ?'

হনুমান বললে--'আমি কিষ্কিন্ধ্যার রাজা সুগ্রীবের দূত মাত্র। সুগ্রীব রামচন্দ্রের কাছে প্রতিজ্ঞা করেছেন, যে কোনও উপায়ে সীতাকে তিনি উদ্ধার করবেন। আর সেই জন্যেই আমি সীতার খোঁজে এখানে এসেছি।'

হনুমানের কথায় রাবণ খুব রেগে গিয়ে তাকে কেটে ফেলতে বললেন। শেষকালে বিভীষণের অনুরোধে রাবণ শান্ত হলেন। তিনি হনুমানের ল্যাজে আগুন ধরিয়ে ছেড়ে দিতে বললেন।

মহানন্দে রাক্ষসেরা হনুমানের ল্যাজে কাপড় জড়িয়ে, তারপর সেই কাপড়টায় বেশ করে তেল দিয়ে ভিজিয়ে আগুন ধরিয়ে দিলো। দেখতে দেখতে ল্যাজের আগুন দাউ-দাউ করে জ্বলে উঠলো।

হনুমানের এই শাস্তির কথা বন্দী সীতা যখন শুনলেন, তখন তাঁর প্রাণ হনুমানের জন্যে বড়ই ব্যাকুল হয়ে উঠলো। হনুমান যাতে আগুন থেকে বাঁচে, সেইজন্যে তিনি হাতজোড় করে অগ্নিদেবের স্তব-স্তুতি করতে আরম্ভ করলেন। অগ্নিদেব সীতার কাতর প্রার্থনায় সন্তুষ্ট হলেন। তিনি হনুমানকে আশীর্বাদ করলেন। অগ্নিদেবের আশীর্বাদে

হনুমানের কিছুই ক্ষতি হলো না। বরং হনুমানের ল্যাজের আগুনে লঙ্কার অধিবাসীদের সমস্ত ঘর-বাড়ী পুড়ে ছাই হয়ে গেল। লোকে যাকে বলতো সোনার লঙ্কাপুরী—দেখতে দেখতে সেই সোনার লঙ্কাপুরী পুড়ে ছাই হয়ে গেল! সমস্ত লঙ্কাকে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়ে হনুমান এক লাফে সমুদ্র পেরিয়ে জাম্বুবান ও অঙ্গদের কাছে ফিরে এলো।

হনুমানের লঙ্কাকাণ্ড

জাম্বুবান আর অন্যান্য বানরেরা হনুমানের মুখে সব কথা শুনে আনন্দে কিষ্কিন্ধ্যার দিকে চললো রামচন্দ্রকে খবরটা জানানোর জন্যে।

হনুমান কিষ্কিন্ধ্যায় এসে রামচন্দ্রকে সব কথা বললেন, এবং সীতা যে মণিটি দিয়েছিলেন, সেটি রামচন্দ্রকে দিতেই রামচন্দ্র হনুমানকে সস্নেহে আলিঙ্গন করলেন।
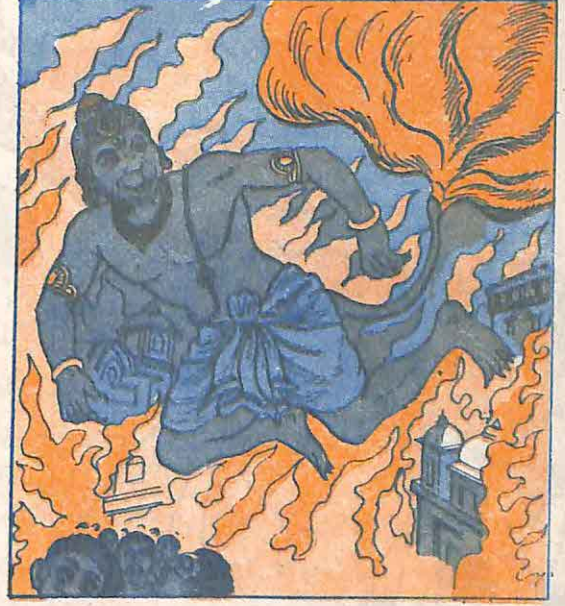
অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

১। "অনেক চেষ্টা……সীতাকে খুঁজতে লাগলো।"

অনেক চেষ্টা করে কে কোথায় পৌঁছালো? তখন কোন্ সময়? সারা লঙ্কাপুরী অন্ধকারে ঢেকে গেছে কেন? হনুমান কি ভাবতে লাগলো? [২+২+২+২]

২। "খুঁজতে খুঁজতে……নিরাশ হয়ে ফিরে গেল।"

হনুমান কোথায় ঢুকে পড়লো? সেখানে কি দেখে হনুমান অবাক হয়ে গেল? [২+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

১। "ইন্দ্রজিৎ যেমন বীর……অশোক কাননে গেলেন।"

ইন্দ্রজিৎ কে? তার আর একটি কি নাম ছিল? [২+২]

লঙ্কা কাণ্ড

হনুমানের কাছে সীতার খবর পেয়ে, তাঁকে উদ্ধার করার জন্যে রামচন্দ্র ব্যস্ত হয়ে উঠলেন। কি কৌশলে সীতাকে উদ্ধার করা যায়, এই নিয়ে জল্পনা-কল্পনা চলতে লাগলো। এই সময়ে সুগ্রীব রামচন্দ্রকে সাহস দিয়ে বললে—'আপনি কিছুমাত্র চিন্তা করবেন না, আমি আমার ভ্রাতুষ্পুত্র যুবরাজ অঙ্গদ, জাম্বুবান, হনুমান প্রভৃতি মহা-বলশালী বীরদের সঙ্গে হাজার হাজার বানর সৈন্য সীতাকে উদ্ধার করার জন্যে পাঠাবো।' কিন্তু বিরাট সমুদ্র পাড়ি দিয়ে কিভাবে লঙ্কায় যাওয়া যাবে, এই নিয়ে রামচন্দ্র খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লেন।

সুগ্রীব রামচন্দ্রকে সাহস দিয়ে বললেন—'আপনি কিছু ভাববেন না, সমুদ্রের উপর

আমি সেতু তৈরী করার ব্যবস্থা করব। নল বিচক্ষণ কারিগর, সেই সেতু তৈরী করে দেবে।'

নলকে সেতু তৈরী করার ভার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য বানর সৈন্য নিয়ে নল আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে "রাম-নাম" উচ্চারণ করতে করতে সমুদ্রের তীরে এসে উপস্থিত হলো। তারপর নলের আদেশে বানর সৈন্যরা সেতু নির্মাণের কাজ আরম্ভ করে দিলো।

ওদিকে রাবণের কাছে খবরটা পৌঁছোতে দেরী হলো না। তিনি খবরটা শুনে একটু চিন্তিত হলেন। তখন রাক্ষসেরা রাবণকে সাহস দিয়ে বলতে লাগলো—তিন ভুবনে আপনার মত বীর কে আছে? বানর সৈন্যরা আপনার কাছে পরাজিত হবেই। আর সেই সঙ্গে আমরা রাম-লক্ষ্মণকে আপনার কাছে বেঁধে নিয়ে হাজির করবো।

রাবণের একটি ছোট ভাই ছিল, তার নাম 'কুম্ভকর্ণ'। সে ছ'মাস ঘুমোতো আর ছ'মাস পরে একদিন জেগে উঠতো। রাম-লক্ষ্মণের বানর সেনাদের কিভাবে পরাজিত করা যায়, তার জন্যে রাবণরাজা একদিন পরামর্শ-সভা ডাকলেন। যেদিন এই পরামর্শ-সভা ডাকা হয়, কুম্ভকর্ণ সেদিন জেগেছিল। কাজেই সেদিন সেও এই পরামর্শ-সভায় যোগদান করেছিল। কুম্ভকর্ণ সীতাহরণের সব কথা শুনে রাবণকে বললো— 'চোরের মতন চুপি চুপি সীতাকে চুরি করে না এনে, যদি যুদ্ধ করে তাকে আনা হতো, তাহলে উপযুক্ত বীরের কাজই করা হতো ; কিন্তু এভাবে সীতাকে অপহরণ করা উচিত হয়নি।'

রাবণের মেজভাই বিভীষণও কুম্ভকর্ণের যুক্তিকে সমর্থন করলেন। বললেন— 'মহারাজ! সীতাকে ফিরিয়ে দিন। রামচন্দ্র সামান্য মানুষ নন। এ যুদ্ধের ফল ভাল হবে না—রাক্ষসকুল ধ্বংস হয়ে যাবে।'

বিভীষণের এই সৎ উপদেশ বেশীর ভাগ রাক্ষসদেরই মনঃপূত হলো না। বিশেষ করে রাবণের পুত্র মেঘনাদ বিভীষণের কথা শুনে চটে গেলেন ; আর সেই সঙ্গে 'ভীতু-কাপুরুষ' বলে বিভীষণকে গালাগালিও দিলেন। শুধু তাই নয়, মেঘনাদের সঙ্গে রাবণও

বিভীষণকে গালাগালি দিতে লাগলেন। শেষে বিভীষণকে রাজধানী থেকে তাড়িয়ে দিলেন।

মনের দুঃখে বিভীষণ লঙ্কা থেকে চলে গেলেন। অবশেষে লজ্জায়, দুঃখে, অপমানে তিনি রামচন্দ্রের কাছে এসে আশ্রয় চাইলেন। রামচন্দ্র বিভীষণের মুখে সব কথা শুনে তাঁকে বন্ধু বলে আশ্রয় দিলেন, আর সেই সঙ্গে জানালেন যে লঙ্কা জয় করে বিভীষণকেই তিনি লঙ্কার রাজ-সিংহাসনে বসাবেন।

এদিকে নলের নির্দেশ মত বানর সৈন্যরা দিনরাত পরিশ্রম করে সমুদ্রের ওপর সেতু তৈরী করে ফেললে। রাম-লক্ষ্মণ বানর সৈন্যদের নিয়ে সদম্ভে লঙ্কায় প্রবেশ করলেন। রামের লঙ্কায় প্রবেশ করার খবর রাবণের কাছে গিয়ে পৌঁছালো। শুক আর সারণ নামে রাবণের দু'জন মন্ত্রী ছিল, তাদের ডেকে রাবণ হুকুম দিলেন—'তোমরা দু'জন গিয়ে খবর নিয়ে এসো, রাম কত সৈন্য নিয়ে লঙ্কায় প্রবেশ করেছে।'

রাবণের আদেশে শুক আর সারণ ছদ্মবেশে রামের সৈন্যদের মধ্যে প্রবেশ করলো। কিন্তু বিভীষণ তাদের চিনতে পেরে বন্দী করে রামচন্দ্রের কাছে হাজির করলেন। শুক-সারণ রাম-লক্ষ্মণের কাছে ক্ষমা চাইল। রাম তাদের মুক্তি দিলেন। রামের এই উদার হৃদয়ের পরিচয় পেয়ে তারা মোহিত হয়ে গেল।

ছাড়া পেয়ে শুক-সারণ রাবণকে রামের সঙ্গে যুদ্ধ না করে সন্ধি করতে অনুরোধ করলো।

রাবণ রেগে গিয়ে শুক-সারণকে অপমান করে তাড়িয়ে দিলেন।

শুক-সারণ চলে গেলে, রাবণ বিদ্যুৎজিহ্ব নামে এক রাক্ষসকে ডেকে পাঠালেন। বিদ্যুৎজিহ্ব ছিল মস্ত বড় যাদুকর। রাবণের আদেশে সে অবিকল রামের মুখের মত একটা কাটা মুণ্ডু আর তাঁর ধনুকের মত একটা ধনুক তৈরী করে নিয়ে রাবণের সঙ্গে সীতার কাছে গিয়ে সেই কাটা মুণ্ডু আর ধনুক দেখিয়ে বললে--'রাক্ষস সৈন্যরা রামকে মেরে ফেলেছে।' রামের সেই নকল কাটা মুণ্ডু দেখে সীতা শিউরে উঠলেন! শোকে দুঃখে তিনি কাঁদতে লাগলেন।

বিদ্যুৎজিহ্বকে নিয়ে রাবণ চলে যাওয়ার পর বিভীষণের স্ত্রী সরমা সীতার কাছে এসে তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'আমি কিছুক্ষণ আগেও দূর থেকে দেখেছি—রাম-লক্ষ্মণ ভাল আছেন। রাক্ষসেরা তাঁদের কিছুই ক্ষতি করতে পারেনি। রামের নকল মুণ্ডু নিয়ে এসে তোমায় দেখিয়েছে, তুমি স্থির হও।'

ওদিকে সুবেল পর্বত থেকে রাম, লক্ষ্মণ, সুগ্রীব আর বিভীষণ দেখতে পেলেন রাবণের এই সব কার্য-কলাপ। এত মিথ্যা, এত অন্যায় সুগ্রীব আর সহ্য করতে পারলেন না। তিনি সেই সুবেল পর্বত থেকে এক লাফে রাবণের ঘাড়ে গিয়ে পড়লেন। ব্যস, আর যায় কোথা। সুগ্রীবের সঙ্গে রাবণের মল্লযুদ্ধ বেধে গেল। সেকি সাংঘাতিক মল্লযুদ্ধ! রাবণ প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন সুগ্রীবকে কাবু করে ফেলতে; কিন্তু কিছুতেই সুগ্রীবের সঙ্গে তিনি পেরে উঠলেন না। সুগ্রীব রাবণের মাথার রাজ-মুকুটটি কেড়ে নিয়ে, এমন এক লাফ মারলেন যে, এক লাফে সুবেল পর্বতে ফিরে এলেন।

এবার রাম যুবরাজ অঙ্গদকে তাঁর দূত নিযুক্ত করে রাবণের কাছে পাঠালেন। অঙ্গদ রাবণকে স্পষ্টই জানিয়ে দিলেন—'সীতাকে যদি ফিরিয়ে না দাও, তাহলে যুদ্ধ করে সীতাকে আমরা উদ্ধার করব।'

এই কথা শুনে রাবণ রেগে গিয়ে অঙ্গদকে বেঁধে ফেলবার আদেশ দিলেন। রাক্ষস সৈন্য যেই অঙ্গদকে বাঁধার জন্যে এগিয়ে এলো, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্গদ তাদের মধ্যে কয়েকজন রাক্ষসকে বগলে পুরে রাজপুরী থেকে বেশ কিছুদূরে নিয়ে গিয়ে, এক একটা রাক্ষসকে আছাড় মেরে, মেরে ফেলতে লাগলো। অঙ্গদের ক্ষমতা দেখে বাকী রাক্ষসেরা ভয় পেয়ে পালিয়ে গেল। অঙ্গদ ফিরে এলেন রাম-লক্ষ্মণের কাছে।

এবার শুরু হলো ভীষণ যুদ্ধ! রাবণ লঙ্কার সেরা সেরা বীরদের যুদ্ধ করতে পাঠালেন। কিন্তু তারা কেউ ফিরে এলো না, সবাই রাম-লক্ষ্মণ আর বানর সৈন্যদের হাতে প্রাণ হারালো।

তখন রাবণ শেষ পর্যন্ত ইন্দ্রজিৎকে পাঠালো যুদ্ধ করতে। তোমাদের আগেই

বলেছি. ইন্দ্রজিতের আর এক নাম 'মেঘনাদ'। ইন্দ্রজিৎ মেঘের আড়াল থেকে যুদ্ধ করতে পারতো।

এছাড়া ইন্দ্রজিতের একটা অস্ত্র ছিল—তার নাম 'নাগপাশ'। এই নাগপাশ ছোঁড়ার সঙ্গে সঙ্গে শত সহস্র সাপ বেরিয়ে এসে শত্রুকে কাবু করে ফেলতো। ইন্দ্রজিৎ এই মহা অস্ত্রটি রাম-লক্ষ্মণকে লক্ষ্য করে ছুঁড়লেন। সঙ্গে সঙ্গে অসংখ্য সাপ রাম-লক্ষ্মণকে জড়িয়ে ধরলো। রাম-লক্ষ্মণ অজ্ঞান হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রাম-লক্ষ্মণের অবস্থা দেখে রাক্ষস সৈন্যরা আনন্দে নাচতে লাগলো। ইন্দ্রজিৎ বেশ গর্বের সঙ্গে রাবণকে গিয়ে জানালেন—'নাগপাশ' অস্ত্রের সাহায্যে রাম-লক্ষ্মণকে তিনি মেরে ফেলেছেন। রাম-লক্ষ্মণের মৃত্যুর খবরে রাবণ স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন।

এদিকে বিভীষণ রাম-লক্ষ্মণের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললেন—'এই সঙ্কটে আপনারা গরুড়কে স্মরণ করুন। গরুড় নিশ্চয়ই আপনাদের রক্ষা করবেন।'

বিভীষণের উপদেশ মত রামচন্দ্র একমনে নারায়ণের বাহন গরুড়কে ডাকতে লাগলেন। রামচন্দ্রের ডাকে গরুড় সাড়া দিলেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই আকাশপথে গরুড়ের আবির্ভাব হলো। গরুড়ের বিশাল পাখার শব্দে সাপগুলো ভয়ে রাম-লক্ষ্মণের দেহ ছেড়ে পালিয়ে গেল। রাম-লক্ষ্মণ সাপের কবলমুক্ত হলেন। রাবণ একথা জানতে পেরে রাম-লক্ষ্মণকে মেরে ফেলবার জন্যে আবার মতলব আঁটতে লাগলেন।

ধূম্রাক্ষ নামে এক বিরাট রাক্ষস ছিল, তার যেমন বিশাল চেহারা, তেমনি ভীষণ শক্তি। রাবণ এই ধূম্রাক্ষের সঙ্গে আরও অনেক রাক্ষস সেনা দিয়ে রামের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠিয়ে দিলেন।

কিন্তু সুগ্রীব, অঙ্গদ, হনুমান প্রভৃতি বানর সেনাদের হাতে সমস্ত রাক্ষসসেনা মারা গেল, আর সেই সঙ্গে ধূম্রাক্ষও প্রাণ হারালো।

শেষ পর্যন্ত রাবণ নিজেই রাম-লক্ষ্মণ আর বানর সেনাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে গেলেন। রাবণকে সসৈন্যে যুদ্ধক্ষেত্রে আসতে দেখে, লক্ষ্মণ রাবণের বিপক্ষে অস্ত্রধারণ

করলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ রাবণের সঙ্গে পেরে উঠলেন না। তখন রামচন্দ্র নিজে এলেন রাবণের বিপক্ষে যুদ্ধ করতে। বাণের পর বাণ নিক্ষেপ করে রামচন্দ্র রাবণকে বিব্রত করে ফেললেন। কিন্তু রামচন্দ্র প্রকৃত যোদ্ধা এবং বীর; তাই তিনি যখন দেখলেন রাবণ সেদিনের যুদ্ধে প্রায় অবসন্ন হয়ে পড়েছেন, তখন সেদিনকার মত রামচন্দ্র যুদ্ধ বন্ধ করে দিলেন।
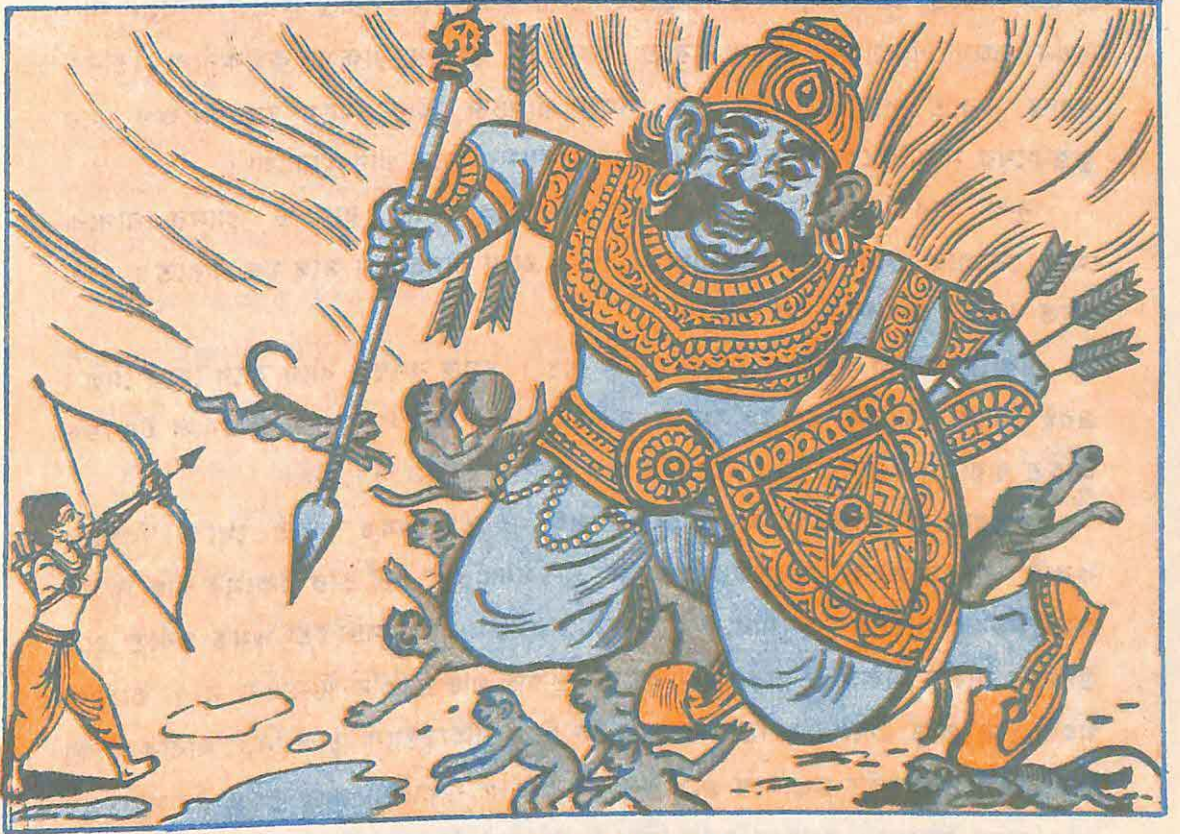
কুম্ভকর্ণ যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলো

রাবণ যুদ্ধক্ষেত্র থেকে প্রাসাদে ফিরে গেলেন এবং অনেক ভেবেচিন্তে কুম্ভকর্ণকে তিনি অকালে ঘুম থেকে জাগিয়ে তুলে, রাম-লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ করতে পাঠালেন। ভীষণ হাঁক-ডাক করে কুম্ভকর্ণ যুদ্ধ করতে এগিয়ে এলো।

কুম্ভকর্ণের দেহটা যেমন বিরাট, দেখতেও তেমনি ভয়ঙ্কর। কুম্ভকর্ণের চেহারা দেখে বানর সেনারা ভয় পেয়ে গেল। কত বানর সেনা যে তার পায়ের চাপে মারা গেল তার আর ইয়ত্তা নেই। শুধু তাই নয়, সেই সঙ্গে অসংখ্য বানর সৈন্যকে কুম্ভকর্ণ গিলে খেয়ে ফেলতে লাগলো।

কুম্ভকর্ণের রণমূর্তি দেখে অঙ্গদ আর সুগ্রীব তাকে জব্দ করার জন্যে নানাভাবে চেষ্টা করতে লাগলেন, কিন্তু কিছুতেই তাঁরা কুম্ভকর্ণকে পরাস্ত করতে পারলেন না। তখন লক্ষ্মণ এগিয়ে এলেন যুদ্ধ করতে ; কিন্তু এই ভয়ঙ্কর রাক্ষস কুম্ভকর্ণকে তিনিও পরাস্ত করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র 'ইন্দ্র' নামে অস্ত্র নিক্ষেপ করে কুম্ভকর্ণের মাথাটা কেটে ফেললেন। কুম্ভকর্ণ রামের হাতে প্রাণ হারালো।

'কুম্ভ' আর 'নিকুম্ভ' নামে কুম্ভকর্ণের দুটি ছেলে ছিল। রামচন্দ্র তাদের বাপকে মেরে ফেলেছে শুনে, তারা রেগে গিয়ে এগিয়ে এলো রামচন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধ করতে। শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র তাদেরও বধ করলেন।

এরপর আবার ইন্দ্রজিৎ এলেন যুদ্ধ করতে। সমস্ত রণস্থল বাণে বাণে ছেয়ে গেল। এরই মাঝে মেঘের আড়াল থেকে একটি বাণ নিক্ষেপ করে রাম-লক্ষ্মণকে ইন্দ্রজিৎ আহত করলেন। রাম-লক্ষ্মণ অচৈতন্য হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

জাম্বুবান রাম-লক্ষ্মণের অবস্থা দেখে, সেই মুহূর্তেই ঋষভ পর্বত থেকে 'বিশল্য-করণী' 'মৃতসঞ্জিবনী' সুবর্ণকরণী' আর 'অস্থিসঞ্চারিণী' এই চার রকমের গাছ সংগ্রহ করে আনতে পাঠালেন হনুমানকে। জাম্বুবানের কথায় হনুমান তো ঋষভ পর্বতে এসে উপস্থিত হলেন ; কিন্তু ঐ চার রকম গাছের একটি গাছও তিনি চিনতেন না। হনুমান মহাচিন্তায় পড়ে গেলেন। তিনি তখন এক টানে পাহাড়টাকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করতেই, ঋষভ পর্বত ছদ্মবেশে এসে হনুমানকে শান্ত করলেন এবং চার রকম ওষুধ তাঁর হাতে দিলেন। হনুমান ওষুধ নিয়ে ফিরে এলো এবং সেই সব গাছের পাতা রাম-লক্ষ্মণকে শোঁকানো হলো। সঙ্গে সঙ্গে রাম-লক্ষ্মণ জ্ঞান ফিরে পেয়ে উঠে বসলেন। শুধু তাই নয়, যুদ্ধক্ষেত্রে আরও যে সব বানর সেনা মরেছিল, এই ওষুধের গুণে তারাও বেঁচে উঠলো।

রাবণ রাজা মনে মনে ভাবতে লাগলেন, এরা মরার পরেও বেঁচে ওঠে কি করে ? বড় বড় রাক্ষস সেনাপতিরা একে একে যখন প্রাণ হারালো, তখন ইন্দ্রজিৎ এক যজ্ঞ শুরু করলেন। এই যজ্ঞের নাম—'নিকুম্ভিলা যজ্ঞ।' এই যজ্ঞ শেষ করে যুদ্ধে গেলে, শত্রুকে সহজেই জয় করা যায়। ইন্দ্রজিৎ নিকুম্ভিলা যজ্ঞ আরম্ভ করলেন। আর সেই সঙ্গে এক নকল সীতা তৈরী করে, বানর সেনাদের সামনে তাকে কেটে ফেললেন।

হনুমান আর বানর সেনারা নকল সীতাকে আসল সীতা মনে করে কাঁদতে কাঁদতে রাম-লক্ষ্মণের কাছে গিয়ে সীতাকে হত্যা করার খবর দিলো। রাম-লক্ষ্মণ বড়ই বিচলিত হয়ে উঠলেন। বিভীষণ কিন্তু কিছুতেই সে কথা বিশ্বাস করতে পারলেন না। ইন্দ্রজিৎ যেখানে নিকুম্ভিলা যজ্ঞ করছিলেন, আসল ঘটনা জানার জন্যে বিভীষণ হনুমান আর লক্ষ্মণকে নিয়ে সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলেন।

তাদের আসতে দেখে ইন্দ্রজিৎ যজ্ঞস্থল থেকে উঠে দাঁড়ালেন ; আর সেই সঙ্গে লক্ষ্মণের সঙ্গে যুদ্ধ শুরু করে দিলো। লক্ষ্মণ "ইন্দ্র" অস্ত্র দিয়ে ইন্দ্রজিতের মাথা কেটে ফেললেন। এইভাবে লক্ষ্মণের হাতে ইন্দ্রজিৎ প্রাণ হারালো।

ইন্দ্রজিতের মৃত্যুর পর রাবণ পুত্রশোকে দিক্-বিদিক্ জ্ঞানশূন্য হয়ে পড়লেন। রাগে, ক্ষোভে তিনি সীতাকে হত্যা করার সঙ্কল্প করলেন। কিন্তু রাবণের স্ত্রী মন্দোদরী অনেক অনুনয় বিনয় করে রাবণকে শান্ত করলেন।

লঙ্কার এই বিপদের জন্যে রাবণ তার নিজের ভাই বিভীষণকে দোষ দিতে লাগলেন। বিভীষণ যদি রামের পক্ষ না নিত, তাহলে লঙ্কার শত সহস্র বীরেরা এভাবে প্রাণ হারাত না। তাই শেষ পর্যন্ত রাবণ ঠিক করলেন, তিনি বিভীষণকেই হত্যা করবেন।

মনে মনে এই রকম যুক্তি করে রাবণ নিজেই যুদ্ধ করতে এলেন। রাবণ বার বার বিভীষণকে মেরে ফেলবার চেষ্টা করতে লাগলেন। কিন্তু লক্ষ্মণ তাঁকে প্রাণপণে রক্ষা করতে লাগলেন। এতে রাবণ খুব রেগে গিয়ে "শক্তিশেল" নামে এক ভয়ঙ্কর অস্ত্রে লক্ষ্মণকে অজ্ঞান করে ফিরে গেলেন।

রামচন্দ্র লক্ষ্মণের শোকে কাঁদতে লাগলেন। তখন সুষেণ রামচন্দ্রকে বললেন, হনুমানকে গন্ধমাদন পর্বতে "বিশল্যকরণী" নামে ওষুধ আনতে পাঠাতে।

হনুমানের গন্ধমাদন পর্বত আনয়ন

রামের আদেশে হনুমান গন্ধমাদন পর্বতে গেলেন। কিন্তু তিনি "বিশল্যকরণীর" গাছ চিনতে না পেরে গোটা পাহাড়টাই মাথায় করে নিয়ে উপস্থিত হলো রাম-চন্দ্রের কাছে। তখন সুষেণ "বিশল্যকরণী" ওষুধ দিয়ে লক্ষ্মণকে বাঁচালেন।

এই সংবাদ শুনে রাবণ রেগে গিয়ে আবার যুদ্ধ করতে এলেন। সাংঘাতিক যুদ্ধ আরম্ভ হলো। এই যুদ্ধ দেখতে অসুরেরা এমন কি দেবতারা পর্যন্ত এসে উপস্থিত হলেন।

অবিরাম যুদ্ধ চলতে লাগলো। রামের অস্ত্রের আঘাতে কখনও বা রাবণ আহত হয়ে পড়েন, কখনও রাবণের অস্ত্রে রাম আহত হয়ে পড়েন। এইভাবে বহুক্ষণ ধরে যুদ্ধ চলার পর রাম "ব্রহ্মাস্ত্র" দিয়ে রাবণের মাথাটা কেটে ফেললেন। সঙ্গে সঙ্গে রাবণ মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন।

রাম-রাবণের এই যুদ্ধে রাম জয়ী হওয়ায় দেবলোক থেকে দেবতারা পুষ্পবৃষ্টি করতে লাগলেন। রাম-লক্ষ্মণের জয়গানে চারিদিক মুখরিত হয়ে উঠলো।

রাম বিভীষণকে লঙ্কার সিংহাসনে বসালেন।

রাম সীতার সঙ্গে দেখা করতে এলেন। সীতা রামের চরণে প্রণাম জানালেন। রাম বললেন—"অনেক বিপর্যয়ের মাঝে তোমাকে আমি উদ্ধার করেছি, কিন্তু রাক্ষসরাজ

রাবণের ঘরে বন্দিনী থাকাকালে তুমি কি ভাবে দিন কাটিয়েছো—তা আমার জানা নেই। স্ত্রীকে উদ্ধার করা স্বামীর কর্তব্য। তাই তোমাকে আমি উদ্ধার করেছি। কিন্তু তোমাকে গ্রহণ করতে পারবো না।"

রামের কথা শুনে দুঃখে, লজ্জায়, অভিমানে সীতার দু'চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়তে লাগলো। সীতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'তোমার মুখ থেকে একথা শোনার চেয়ে আমার মৃত্যুই ভালো—।' লক্ষ্মণকে উদ্দেশ্য করে সীতা বললেন—'লক্ষ্মণ, তুমি আগুন জ্বালো, আমি সেই আগুনে প্রাণ বিসর্জন দিই।'

সীতার কথা শুনে লক্ষ্মণ কাঁদতে কাঁদতে সীতার ইচ্ছামত আগুন জ্বাললেন। সীতা সেই আগুনে ঝাঁপ দিলেন।

সীতার অগ্নি পরীক্ষা

সেই বিরাট অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে থেকে স্বয়ং অগ্নিদেব এসে সীতাকে রক্ষা করলেন। আর রামচন্দ্রের উদ্দেশ্যে বললেন—'কোন পাপই সীতাকে স্পর্শ করেনি। নিষ্পাপ নিষ্কলঙ্ক বলেই তিনি রক্ষা পেলেন। সীতা--সাধ্বী! সীতা--সতীলক্ষ্মী!' রাম অগ্নিদেবের কথায় সীতাকে গ্রহণ করে সন্তুষ্টচিত্তে অযোধ্যায় ফিরে এলেন।

চোদ্দ বছর পরে রাম-লক্ষ্মণ আর সীতাকে পেয়ে অযোধ্যাবাসীরা আনন্দ উৎসবে মেতে উঠলো। এরপর বশিষ্ঠ, নারদ এবং অন্যান্য মুনি ঋষিরা এক শুভদিনে রাজ্যাভিষেক করে, রামচন্দ্রকে অযোধ্যার সিংহাসনে বসালেন।

অযোধ্যাবাসীর বহুদিনের মনোবাসনা পূর্ণ হলো। রামরাজ্যে প্রজারা মহাসুখে দিন কাটাতে লাগলো।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

(১) বিভীষণ ও কুম্ভকর্ণ রাবণকে যুদ্ধ না করা সম্পর্কে কি উপদেশ দিয়েছিলেন ? (২) বিদ্যুৎজিহ্ব রাবণের আদেশে কি কাজ করেছিল ? (৩) ইন্দ্রজিতের আর এক নাম মেঘনাদ হওয়ার কারণ কি ? (৪) ইন্দ্রজিতের মৃত্যু হলো কিভাবে এবং কার হাতে ? (৫) সীতাকে উদ্ধারের পর কেন সীতা অগ্নিকুণ্ডে ঝাঁপ দিয়েছিলেন ?

[প্রতিটি ১ নম্বর]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

(১) সমুদ্রের উপর সেতু বন্ধন করেছিলেন কে ? (২) কুম্ভকর্ণের দুই পুত্রের নাম কি ? (৩) সুগ্রীব মল্লযুদ্ধে রাবণের কি দশা করেছিল ? (৪) রামচন্দ্র কোন্ অস্ত্রে কুম্ভকর্ণের মাথা কেটেছিলেন এবং কোন্ অস্ত্রে রাবণকে নিধন করেছিলেন ?

[প্রতিটি ২ নম্বর]
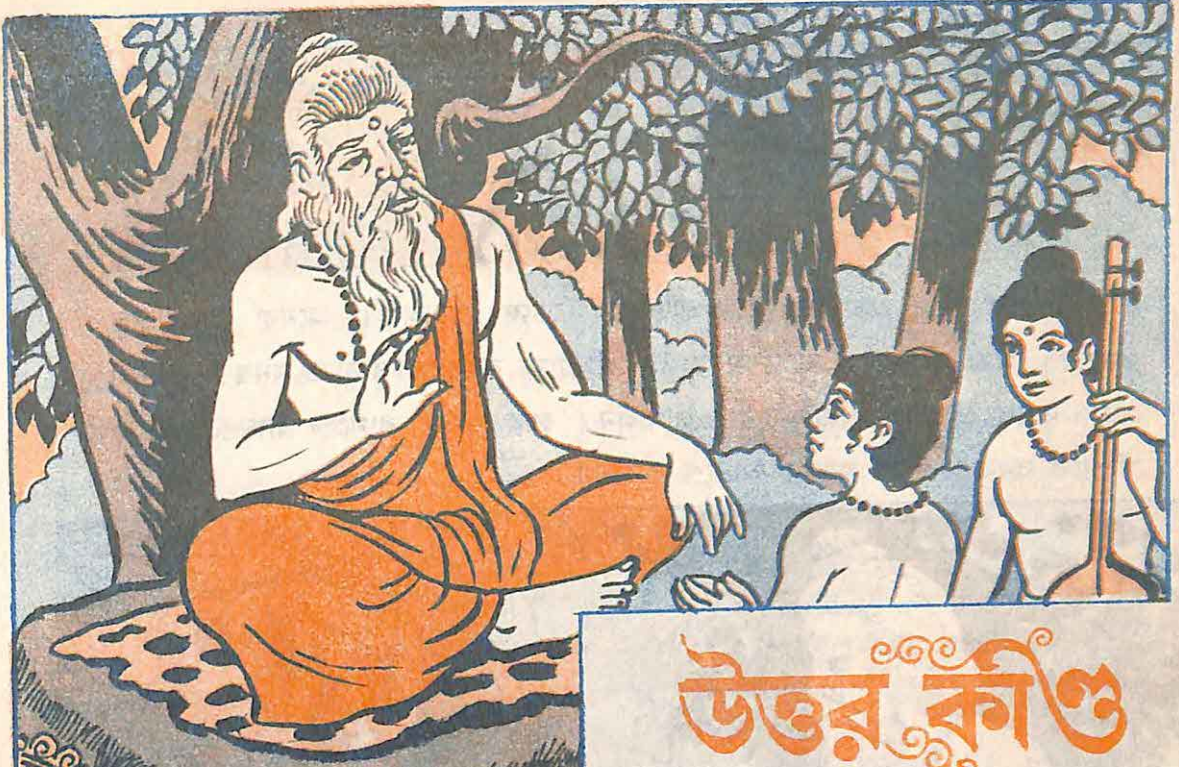
উত্তর কাণ্ড

রামচন্দ্রের রাজ্য পরিচালনায় প্রজাদের কোনও অভাব-অভিযোগ কিছুই রইল না তাই আজও লোকের মুখে মুখে রাম রাজ্যের সুব্যবস্থার কথা শোনা যায়।

জনম দুঃখিনী সীতার ভাগ্যে কিন্তু বেশীদিন রাম রাজ্যের এই সুখ ভোগ করা সম্ভব হলো না। অযোধ্যায় যখন আনন্দের হাট, প্রজারা মহা আনন্দে রাজা রামচন্দ্রের জয়গান করছে। তারই মাঝে হঠাৎ রামচন্দ্র একদিন শুনতে পেলেন—সীতা রাক্ষসরাজ রাবণের অন্তঃপুরে অনেকদিন বন্দিনী অবস্থায় কাটিয়েছেন--কাজেই অযোধ্যার রাণী হয়ে রাজ সিংহাসনে বসা তাঁর শোভা পায় না।

রামচন্দ্র লোক-পরম্পরায় প্রজাদের মনের

কথা জানতে পেরে ক্ষোভে, দুঃখে-অভিমানে ভেঙে পড়লেন। অনেক ভেবেচিন্তে প্রজাদের মনঃতুষ্টির জন্যে শেষ পর্যন্ত সীতাকে বনবাসে পাঠাতে মনস্থ করলেন। লক্ষ্মণ দুঃখে, লজ্জায় আক্ষেপ করতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত রামচন্দ্র লক্ষ্মণকে ডেকে সীতাকে বনবাসে দিয়ে আসতে আদেশ করলেন।

বাল্মীকির আশ্রমে সীতাদেবী

অনিচ্ছাসত্ত্বেও যথাসময়ে লক্ষ্মণ সীতাকে নিয়ে বনবাস যাত্রা করলেন। সীতা কিন্তু তখনও জানেন না তিনি কোথায় যাচ্ছেন। আর লক্ষ্মণ তাঁকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে ? সহসা সীতা দেখতে পেলেন লক্ষ্মণের চোখের জলে বুক ভেসে যাচ্ছে। লক্ষ্মণ কেন কাঁদছেন---একথা জিজ্ঞাসা করে সীতা সব জানতে পারলেন।

সীতাকে যে সময় বনবাসে পাঠানো হয়, তখন সীতা ছিলেন সন্তান-সম্ভবা। সেই কারণে লক্ষ্মণ বড়ই চিন্তিত হয়ে পড়লেন। অবশেষে অনেক চিন্তা করে লক্ষ্মণ বাল্মীকির তপোবনে সীতাকে রেখে প্রণাম জানিয়ে কাঁদতে কাঁদতে অযোধ্যায় ফিরে এলেন। শোকাচ্ছন্ন অযোধ্যার রাজপুরী সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে যেন আঁধারে ডুবে গেল !

এদিকে বাল্মীকি মুনি পরম স্নেহে সীতাকে তাঁর কুটিরে আশ্রয় দিলেন। পিতা যেমন কন্যাকে স্নেহে লালন-পালন করেন, তেমনি স্নেহেই বাল্মীকি মুনি সীতাকে দেখাশোনা করতে লাগলেন।

এমনি ভাবে বেশ কিছুদিন কেটে যাওয়ার পর, মুনির আশ্রমে সীতার দুই যমজ পুত্র হলো। বাল্মীকি পরম আদরে তাদের নামকরণ করলেন 'কুশ আর লব'। ছেলে দুটিকে কোলে পেয়ে সীতার দুঃখের খানিকটা লাঘব হলো।

দেখতে দেখতে লব-কুশ বড় হতে লাগলো। মুনি তাদের সস্নেহে নানা শাস্ত্র শিক্ষা দিতে লাগলেন, আর সেই সঙ্গে যুদ্ধবিদ্যাও শেখাতে লাগলেন। শুধু শাস্ত্র আর যুদ্ধ-বিদ্যাই নয়, লব-কুশ দুই ভাই বীণা বাজিয়ে মুনি ঋষিদের আশ্রমে 'রামায়ণ' গান করতো, আর তাদের সেই সুমধুর গানে সারা বন যেন আনন্দমুখর হয়ে উঠতো।

রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠানোর পর দেখতে দেখতে বারো বৎসর কেটে গেল। শুধু প্রজাদের জন্যেই রামচন্দ্র সীতাকে বনবাসে পাঠিয়েছিলেন, কিন্তু মনে তাঁর একটুও সুখ ছিল না, তাই তিনি অশ্বমেধ যজ্ঞ করার ইচ্ছা করলেন।

মন্ত্রীরা রাজার ইচ্ছামত যজ্ঞের আয়োজন করতে লাগলেন। নানান দেশ থেকে মুনি ঋষি, রাজা-মহারাজা ব্রাহ্মণ-পণ্ডিতেরা অযোধ্যায় এসে উপস্থিত হলেন।

যথাসময়ে যজ্ঞ আরম্ভ হলো, এরই মাঝে বাল্মীকি মুনি দুটি কিশোরকে সঙ্গে নিয়ে যজ্ঞস্থলে উপস্থিত হলেন। তাদের হাতে বীণা। অনিন্দ্যসুন্দর এই কিশোর দু'টির দিকে চেয়ে সকলেই মোহিত হয়ে গেলেন। তারা যজ্ঞস্থলে এসে বীণা বাজিয়ে রামায়ণ গান

করতে লাগলো। তাদের মধুর কণ্ঠস্বরে সকলেই মুগ্ধ হয়ে গেলেন। কৌশল্যা কিশোর দু'টিকে সযত্নে কাছে টেনে নিয়ে তাদের পরিচয় জানতে চাইলেন। কিশোর দু'টি জানালো তাদের মা সীতা।

লব ও কুশ বীণা বাজিয়ে রামায়ণ গান করতে লাগলো

কিশোরদের মাতৃ পরিচয় পাবার সঙ্গে সঙ্গে কৌশল্যা মূর্চ্ছিত হয়ে মাটিতে লুটিয়ে পড়লেন। রামচন্দ্র পুত্রদের দেখে বিচলিত হয়ে উঠলেন। দুঃখে, লজ্জায়, অনুশোচনায় তাঁর হৃদয় উদ্বেলিত হয়ে উঠলো।

বাল্মীকি রামচন্দ্রকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন—'সাধ্বী সীতাকে তুমি বনবাসে পাঠিয়ে তাকে অনেক কষ্ট দিয়েছো। তুমি তাঁকে আর বনবাসে রেখো না। সসম্মানে তাঁকে ফিরিয়ে এনে পুনরায় রাজ-সিংহাসনে বসাও।'

মুনির কথায় রামচন্দ্র বললেন—'প্রজাদের মনোরঞ্জনের জন্যে অনিচ্ছা সত্বেও আমাকে একাজ করতে হয়েছিল। প্রজারা যদি আবার সীতাকে ফিরিয়ে আনার জন্যে সম্মত হয়, তাহলে পরম সমাদরে সীতাকে ফিরিয়ে এনে, আবার আমি রাজ অন্তঃপুরে তাঁকে স্থান দেব।'

রামচন্দ্রের কথা শুনে বাল্মীকি তপোবনে ফিরে এলেন, এবং সীতাকে অযোধ্যার রাজসভায় নিয়ে এলেন। তারপর অগ্নিসাক্ষী রেখে অযোধ্যার সমস্ত প্রজাদের সামনে বাল্মীকি ঘোষণা করলেন—'সীতা নিষ্পাপ। কোন পাপই তাঁর দেহ বা মনকে স্পর্শ

করেনি। এখন আপনারা যদি সম্মত হন, তাহলে শ্রীরামচন্দ্র আবার তাঁকে গ্রহণ করবেন।'

বাল্মীকির কথায় অযোধ্যার প্রজারা সকলেই সীতাকে গ্রহণ করতে রাজী হলো।

এরই মাঝে আবার প্রজাদের মধ্যে সীতাকে গ্রহণ করার বিপক্ষে কিছুলোক মত প্রকাশ করলো। সীতা লজ্জায়, ঘৃণায়, দুঃখে, অপমানে কাঁদতে লাগলেন। একদিন যাঁর আবির্ভাব হয়েছিল পৃথিবীর মাটি থেকে, সেই পৃথিবীকেই সম্বোধন করে সীতা কাঁদতে কাঁদতে বললেন—'মা বসুধা! তোমার কৃপাতেই এই মাটির পৃথিবীতে আমার আবির্ভাব ঘটেছিল, তুমি দ্বিধা-বিভক্ত হও, আমি তোমার কোলে আবার আশ্রয় গ্রহণ করে এই নিদারুণ জ্বালা যন্ত্রণার হাত থেকে নিষ্কৃতি লাভ করি।'

সীতার পাতাল প্রবেশ

সীতা এই কথা বলার সঙ্গে সঙ্গেই মাটি ফেটে গেল আর তার ভিতর থেকে মা বসুমতী বেরিয়ে এসে সীতাকে কোলে নিয়ে অদৃশ্য হ'লেন। সেই সঙ্গে জনমদুখিনী সীতা চিরদিনের মত বসুমতীর কোলে আশ্রয় নিলেন।

লব-কুশ মাতৃহারা হয়ে ব্যাকুল ভাবে 'মা-মা' বলে পৃথিবীর মাটি আঁকড়ে ধরে কাঁদতে লাগলো। সেই সঙ্গে সকলেই হায় হায় করে উঠলো।

যে অযোধ্যা ছিল একদিন আনন্দের হাট, সে অযোধ্যা চিরদিনের জন্যে নিরানন্দে ডুবে গেল। যিনি একদিন বসুমতীর কৃপায় পৃথিবীতে এসেছিলেন, আবার তিনি

বসুমতীর কোলেই আশ্রয় নিলেন। এরপর কেটে গেছে কত দিন, কত মাস, কত বছর, কত যুগ—কিন্তু সীতার ব্যথা-বেদনার কথা, শ্রীরামচন্দ্রের শৌর্য-বীর্য আর প্রজানুরঞ্জনের জন্যে সীতাকে ত্যাগের কাহিনী, রাম রাজ্যের কথা চিরদিনের জন্যে স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে ও ভবিষ্যতেও থাকবে।

অনুশীলনী

বিষয়মুখী প্রশ্ন

(১) রামচন্দ্র সীতাকে কেন বনে পাঠিয়েছিলেন? (২) কার আশ্রমে গিয়ে সীতা আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন? (৩) বাল্মীকি মুনি সীতাকে অযোধ্যায় পুনরায় ফিরিয়ে আনার পর কেন সীতা মা বসুমতীর কোলে চিরতরে আশ্রয় গ্রহণ করলেন? (৪) লব-কুশ কে? (৫) আজও লোকের মুখে মুখে রাম-রাজ্যের সুব্যবস্থার কথা শোনা যায় কেন?

[২+২+২+২+২]

সংক্ষিপ্ত প্রশ্ন

(১) সীতাকে বনবাসে কে দিতে গেল? (২) সীতা কিভাবে তাঁর বনবাসের কথা জানতে পারলেন? (৩) সীতার ছেলেদের কে নামকরণ করলেন? (৪) সীতার দুঃখের খানিকটা লাঘব হলো কেন? (৫) সীতাকে বনবাসে পাঠিয়ে কে কোন্ যজ্ঞ করেছিলেন? (৬) লব-কুশের পরিচয় কে জানতে চাইলেন?

[২+২+২+২+২+২]